ছোট কাকী

ও

অন্যান্য গল্প

~~~

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৩২২

শ্রীজলধর সেন
~~~

PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJI
201, Cornwallis Street, Calcutta

AND

PRINTED BY S. C. BHATTACHARJEE
AT THE MANASI PRESS,
14A, Ramtanu Bose's Lane, Calcutta.

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

পরম স্নেহভাজন মহিষাদলাধিপতি

শ্রীমান্ রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর

করকমলেষু।

রাজন্,

মহিষাদল রাজপরিবারের সহিত আমার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; মহিষাদল রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়াই 'প্রবাসচিত্র', 'হিমালয়' লিখি। সেই অতীত স্মৃতি আমার চির-সহচর; তাই এই ক্ষুদ্র উপহারের আয়োজন। সুদুরপ্রবাসী শিক্ষাগুরুর এই ক্ষুদ্র স্মৃতি-চিহ্ন সাদরে গৃহীত হইবে, ইহা দুরাশা বলিয়া মনে করিতে পারি না।

চিরশুভানুধ্যায়ী

কলিকাতা

শ্রীজলধর সেন।

ছোট কাকী।

—:০:—

১

নয় বৎসরের একটি পুত্র রাখিয়া রামদয়ালের স্ত্রী স্বর্গারোহণ করিলেন। বত্রিশ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইয়া রামদয়াল বড় বিপদে পড়িলেন—হৃদয়েও দারুণ ব্যথা পাইলেন। তবে রামদয়াল খাঁটি বাঙ্গলানবীশ, পাড়াগাঁয়ের জমিদারের কাছারীর ১৬ টাকা বেতনের তহশীলদার;—তাঁহার পত্নীশোক কবিতামুখে উচ্ছ্বসিত হইল না, বা দীর্ঘকেশ ও গৈরিকবসনেও প্রকটিত হইল না। দিন যেমন যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল;—আকাশের নক্ষত্রও খসিয়া পড়িল না,—অশ্রুপ্রবাহে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাও অভিষিক্ত হইল না; কিন্তু রামদয়াল বড়ই বিপদে পড়িলেন!—বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিলেন না; কনিষ্ঠ কৃষ্ণদয়াল বর্দ্ধমানের উকীল; তিনি সপরিবারে সেইখানেই থাকেন। তাঁহার স্ত্রী পল্লীগ্রামে খড়ের চালা-ঘরে বাস করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত। সুতরাং পরিবারে লোক থাকিয়াও নাই।

স্ত্রীর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত রামদয়াল নিজেই রন্ধনাদির ভার গ্রহণ করিলেন। পিতা-পুত্রে অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেন। শ্রাদ্ধের সময়ে কৃষ্ণদয়াল বাবু তিনদিনের জন্য বাটীতে আসিলেন ;—সপরিবারে নহে, একাকী। শ্রাদ্ধশেষে রামদয়াল বাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রস্তাব করিলেন, "তুমি অমরকে সঙ্গে লইয়া যাও। বাড়ীতে থাকিলে তাহার পড়াশুনাও হইবে না, দেখেশুনেই বা কে? দুইটা ভাত দিবারও লোক নাই।" প্রতিবেশীরা একটি বয়স্থা মেয়ে দেখিয়া দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। রামদয়াল একই কথা বলেন, "অমরনাথ বাঁচিয়া থাকুক।"

কৃষ্ণদয়াল বাবু দাদার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না,—মনে মনে অনিচ্ছা থাকিলেও সম্মত হইলেন। রামদয়াল একমাত্র পুত্রকে বর্দ্ধমানে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদয়াল তিনদিন পরেই চলিয়া গেলেন ; যাইবার সময় দাদাকে বলিয়া গেলেন, তিনি যেন সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং অমরকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া আসেন।

আজ নয় বৎসর অমরকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, এক দিনের জন্য চোখের আড়াল করেন নাই ; অমরকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া আসিতে রামদয়ালের মনে বড়ই কষ্ট হইল ; কিন্তু কি করেন,—উপায় নাই।

যাইবার কথা শুনিয়া অমর বড়ই বিষণ্ণ হইল। "বাবা আমি তোমার কাছেই থাক্‌বো। আমি ত বাবা দুষ্টুমি করিনে!" একদিন বড়ই কাতরভাবে অমরনাথ পিতাকে এই কয়টি কথা বলিল।

রামদয়াল অনেক করিয়া ছেলেকে বুঝাইলেন। কাকার কাছে কোন কষ্ট হইবে না; লেখাপড়া না শিখিলে কি চলে?—অগত্যা অমর যাইতে স্বীকার করিল।

২

মাতৃহীন অমরকে লইয়া রামদয়াল বাবু যথাসময়ে বর্দ্ধমানে কৃষ্ণদয়াল বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদয়াল তখন বাসাতেই ছিলেন; তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাদার পায়ের ধূলা লইলেন। অমরকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণদয়ালের পত্নী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রামেন্দ্র বাবুর কন্যা। সবজজের মেয়ে বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট আত্মগরিমা ছিল, এবং কৃষ্ণ-দয়াল এম, এ, বি, এল, হইলেও জুনিয়ার উকীল বলিয়া পত্নী মনোরমা তাঁহাকে কৃপার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার যাহা কিঞ্চিৎ পসার হইয়াছে, তাহা যে মনোরমার পিতার সই-সুপারিসের জোরে, তাহা ভাবিয়া তিনি বিশেষ গর্ব্বিতা ছিলেন। একদিন পাড়ার কোনও জুনিয়ার উকীলের স্ত্রী তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া তাঁহার স্বামীর ভাল উপার্জ্জন হইতেছে না, অথচ কৃষ্ণদয়াল বাবু তাঁহার পরে আসিয়াও বেশ পসার করিয়াছেন, বলিয়া কৃষ্ণ দয়ালের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মনোরমার এ স্বামী-প্রশংসা ভাল লাগিল না। তাঁহার স্বামী যে নিজের গুণে পসার করিয়া-ছেন, এ কথা প্রতিপন্ন হইলে তাঁহার পসার যে কমিয়া যায়! তাই তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "ভাগ্যি বাবা সবজজ ছিলেন, তাই

হাকিমদিগকে বলিয়া কহিয়া দিয়াছিলেন; তা' নইলে আমাদের বাসাখরচই চলিত না। আর বাবা ত সর্ব্বদাই জিনিসটাপত্রটা দিয়া সাহায্য করিতেছেন।" মনোরমার পরিচয় দিবার আর আবশ্যক হইবে না। তবে একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক,—মনোরমার সন্তানাদি হয় নাই।

অমর যখন বাড়ীর মধ্যে যাইয়া কাকীমাকে প্রণাম করিল, তখন মনোরমা কি একখানি বই পড়িতেছিলেন। অমর প্রণত হইলে তিনি একবার তাহার দিকে চাহিলেন, এবং পরক্ষণেই বই পড়িতে লাগিলেন। অমর একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

অমর দ্বারের বাহির হইবামাত্রই মনোরমা বিশেষ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "ভাল একটা গেরো এসে জুটলো!"

বৈঠকখানাঘরের পাশেই ছোট একটি কুঠুরী; তাহাতে কৃষ্ণদয়াল বাবুর মোহরের হরেকৃষ্ণ শয়ন করিত। অমরের জন্য হরেকৃষ্ণ সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিল। ছেলেমানুষ, পড়াশুনা করিবে, নির্জ্জন ঘর হইলেই ভাল হয়। হরেকৃষ্ণ নিজের তক্তপোষখানি অমরকে ছাড়িয়া দিল। বাড়ীর ভিতর হইতে মনোরমা অনেক অনুসন্ধানে একখানি ছেঁড়া লেপ ও একটা মলিন বালিস বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন;—ইহাই অমরের বিছানা। কৃষ্ণদয়াল অমরকে মিউনিসিপাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

গিন্নির আদেশ ছিল, বাবুর ও তাঁহার নিজের জন্য সরু-চাউলের ভাত হইবে, আর সকলের জন্য মোটা-চাউলের ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ-ঠাকুর ত আর এম, এ, বি, এল নয়, বা তাহার বাড়ীতে সবজজের মেয়ে বধূরূপেও বিরাজমানা নহে; সুতরাং সে ভদ্র-গৃহস্থের বাড়ীর যেমন দস্তুর, তাহাদের মত গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও যাহা হইয়া থাকে, সেই ভাবিয়া, অমরের জন্যও সরু-চাউল বাহির করিয়া লইত। এ ব্যাপার পাঁচছয় দিন গৃহিণীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল। এক দিন হঠাৎ তিনি রান্নাঘরে যাইয়া দেখেন, অমর সরু-চা'লের ভাত খাইতেছে। সবজজের কন্যা আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কাহার হুকুমে ঠাকুর এত সরু চাউল নষ্ট করিতেছে, বলিয়া ঠাকুরের কৈফিয়ৎ তলব হইল। ঠাকুর ভালমানুষ; সে বলিল, "মা ঠাকরুণ, খোকা বাবু আপনার পেটের ছেলের মত, তাই ভাবিয়া তাকেও সরু-চাউলের ভাত দিই।" গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "আরে আমার পেটের ছেলে!"—আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদয়াল বাবু স্নান করিবার জন্য ভিতরে আসিলেন, এবং "ব্যাপার কি" জিজ্ঞাসা করায় "কিছু না" বলিয়া গৃহিণী উপরে চলিয়া গেলেন। সেইদিন হইতে চাকর-বাকরের হাঁড়িতে অমরের অন্নের বরাদ্দ হইল।

৪

একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া অমর কাঁদ-কাঁদ মুখে বাড়ীর মধ্যে গেল। বিকালে সে আর কখন বাড়ীর ভিতর যাইত

না ; কারণ, তাহার ছোটকাকা বা ছোটকাকী তাহার জন্য কোনও প্রকার জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দেন নাই। দুইতিন দিন দেখিয়া হরেকৃষ্ণ নিজ হইতে রোজ অমরকে দুইটি করিয়া পয়সা দিয়া যাইত, অমর তাহারই দ্বারা জল খাইয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিত। অমরের উপর হরেকৃষ্ণের বড়ই স্নেহ হইয়াছিল। গরীবের দুঃখ গরীবেই বুঝে!

অমর আজ বাড়ীর ভিতর যাইয়া কাকীমাকে বলিল, "কাকীমা, আজ তিনদিন আমাকে স্কুলে যাইয়া একঘণ্টা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় ; আমার রোজই লেট (late) হয়।"

"লেট হয়, তার আমি কি করবো?"

"আপনি যদি ঠাকুরকে একটু বোলে দেন, তা হ'লে সে আর একটু সকালে ভাত দিতে পারে।"

"সে সব হবে-টবে না। তোমার জন্য আবার সকালে কে ভাত রাঁধতে যাবে? সকলে যেমন খায়, তেমনি খেয়ে থাকতে পার থাক, না পার দেশে চলে যাও। ঠাকুরপুত্র আর কি!"

অমর আর কথা কহিতে পারিল না ; সে কাঁদিয়া ফেলিল। অপরাহ্নে হরেকৃষ্ণ বাসায় আসিলে অমর তাহাকে সকল কথা বলিল। হরেকৃষ্ণ লেখাপড়া সামান্যই জানে, কিন্তু তাহার হৃদয় বড়ই কোমল। সে অমরের কথা শুনিয়া সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার চক্ষে জল দেখিয়া অমরও কাঁদিতে লাগিল। শেষে হরেকৃষ্ণ বলিল, "কেঁদো না ভাই ; কষ্ট না করলে কি লেখাপড়া হয়? বিদ্যাসাগরের নাম ত জান, তিনি

কত কষ্ট করে পড়াশুনা করেছিলেন, তাই তিনি বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন। তুমিও কষ্ট কোরছো, তুমিও বিদ্যাসাগর হবে। আজ আমি বাবুকে বলে তোমার সকালে ভাতের বন্দোবস্ত কোরে দেবো।"

সেইদিন রাত্রে কৃষ্ণদয়াল যখন কাজকর্ম্ম সারিয়া বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য উঠিলেন, সেই সময়ে হরেকৃষ্ণ অমরের দেরিতে স্কুলে যাওয়ার কথা বলিল; গিন্নী কি বলিয়াছেন, সে কথা আর বলিল না।

কৃষ্ণদয়াল বাবু শয়নগৃহে গিয়া মনোরমাকে বলিলেন, "দেখ, ঠাকুরকে বলে দিও—কা'ল্ থেকে যেন একটু সকাল-সকাল রান্না করে। অমরের স্কুলে যেতে দেরী হয়,—সেই জন্য তাকে নাকি শাস্তি পেতে হয়।"

মনোরমা এই কথা শুনিয়া একেবারে ফুলিয়া উঠিলেন; অতি কর্কশস্বরে বলিলেন, "তা তোমার চাকর-বামুন, হুকুম কর্‌লেই পার। আমি কোথাকার কে যে, তোমার চাকরের উপর হুকুম চালাতে যাবো? আমার এক পেট, খেতে দিতে যদি কষ্ট হয়—বল্‌লেই পার, আমি বাপের বাড়ী চলে যাই। তারা আর আমাকে ফেল্‌তে পারবে না। এত অপমান কেন? এখন ভাইপো আপন হোলো; আর আমার বাবা যে এতগুলি টাকা গণে দিয়েছিলেন, তা' এখন মনে হবে কেন?"

কৃষ্ণদয়াল একেবারে নিরুত্তর; কোন কথা না বলিয়াই তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিলেন; সে দিন আর আহার

হইল না। অন্তঃপুরে যে সুধাপান করিয়া আসিলেন, তাহাতেই তাঁহার উদর পরিতৃপ্ত হইল।

৫

মাঘ মাস; বড় শীত। সেবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা শীত একটু বেশী পড়িয়াছিল। অমর একলা সেই ছোট কুঠুরীতে থাকে। একদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে ছেলেমানুষ শয্যা কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রাতে উঠিয়াই অমর সে কথা তাহার সুখ-দুঃখের একমাত্র সুহৃৎ হরেকৃষ্ণের নিকট অতি সঙ্কুচিতভাবে বলিতেছিল, এমন সময়ে ঝি সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। সেদিন প্রাতে আবার বৃষ্টি হইতেছিল। একে মাঘ মাস, তাহাতে আবার বৃষ্টি; শীত আরও বেশী হইয়াছিল। ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে—?" হরেকৃষ্ণ বলিল, "ছেলেমানুষ, রাতে উঠ্‌তে পারেনি; তাই ঘুমের ঘোরে।"—ঝি বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করিয়াই সে কথা মনোরমাকে বলিল।

তখনও বৈঠকখানায় লোকজন আসে নাই, তখনও বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। মনোরমা একেবারে বৈঠকখানায় হাজির! "লক্ষীছাড়া ছোঁড়া! তোল্ বিছানা মাদুর। এখনই পুকুর থেকে সব কেচে নিয়ে আয়। কি আমার আদুরে গোপাল রে!" হরেকৃষ্ণ কি বলিতে যাইতেছিলেন, গৃহিণী তাঁহাকে এক ধমক দিয়া নিরস্ত করিলেন। আবার হুকুম হইল, "তোল্ বিছানা। এখুনি কেচে এনে দিবি, তবে আমি এখান থেকে নড়বো।"

নয় বৎসরের ছেলে অমরনাথ ভয়ে একবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। কি করে? সেই শীতের দিনে, সেই বৃষ্টির মধ্যে, কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া অমরনাথ প্রথমে লেপটি লইয়া ভিজিতে ভিজিতে পুষ্করিণীতে গিয়া তাহা কাচিয়া আনিল, তাহার পর সেই ছেঁড়া মাছুরটি লইয়া আবার ঘাটে গেল। শানবাঁধা ঘাট, বৃষ্টি পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়াছিল; অমর পা-হড়কাইয়া সেই ঘাটে পড়িয়া গেল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। ঘাটে পড়িয়া গিয়া একবার শুধু সে বলিল, "বাবা গো!" তাহার পর কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল; কিন্তু বসিয়া থাকিয়া কি হইবে! কাকীমা যে বকিবেন। পায়ে ও মাথায় বড়ই লাগিয়াছিল; অমর অতি কষ্টে উঠিল! মাছুরটা জলে ডুবাইয়া তুই হাতে ধরিয়া লইয়া আসিল; মাছুরের জলে তাহার কাপড়খানি একেবারে ভিজিয়া গেল, বৃষ্টিতেই পূর্ব্বে অনেকটা ভিজিয়াছিল।

সে দিন রবিবার; অমরের স্কুল বন্ধ। সমস্ত দিন চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় অমরের কেমন অসুখ করিতে লাগিল। সে কিছুই আহার করিল না; রাত্রে ভয়ানক জ্বর।

প্রাতঃকালে কৃষ্ণদয়াল বাবু শুনিলেন, অমরের জ্বর হইয়াছে। "সামান্য জ্বর, সারিয়া যাইবে। আজ কিছু খেতে দিও না!" ভ্রাতুষ্পুত্রকে না দেখিয়াই এই আদেশ প্রচার করিয়া কৃষ্ণদয়াল বাবু স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন; এবং দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া কাছারীতে গেলেন।

অপরাহ্নে কাছারী হইতে আসিয়া হরেকৃষ্ণ দেখিল, অমর

বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। নিকটে কেহই নাই। গায়ে হাত দিয়া দেখে, গা ভয়ানক গরম, চক্ষু দুইটি জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, আর অমর অনবরত মাথা নাড়িতেছে। হরেকৃষ্ণকে দেখিয়া অমর বলিল, "দাদা! একটু জল খাবো, তৃষ্ণায় আমার বুক ফাটিয়া গেল যে দাদা!" ঘরে একটু জলও কেহ রাখিয়া যায় নাই। হরেকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি একটু জল আনিয়া অমরের মুখে দিল; কতকটা জল সে গিলিল, কিন্তু আর কতকটা গিলিতে পারিল না।

কৃষ্ণদয়াল বাবু সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বাসায় আসিল। তখন হরেকৃষ্ণ বলিল, "অমরের জ্বর বড়ই বেশী হইয়াছে।" কৃষ্ণদয়াল বাবু বলিলেন, "রাতটা যাক্‌, কা'ল সকালে কেষ্ট কম্পাউণ্ডারকে ডেকে যা হয় করা যাবে।" হরেকৃষ্ণ বলিল, "বাবু, জ্বরটা ভাল বোধ হোচ্চে না, একবার ডাক্তার ডাক্‌লে হয় না?"

"না হে, অত ব্যস্ত হ'লে কি চলে?—তা, না হয়, তুমি সরকারী-ডাক্তারখানায় গিয়ে আমার নাম ক'রে একটু ফিবার মিক্‌শ্চার এনে দাও।"

হরেকৃষ্ণ বিষণ্ণমুখে র‍্যাপারখানি গায়ে দিয়া ডাক্তারখানায় গেল। কিন্তু সে প্রথমে ডাক্তারখানায় না গিয়া একেবারে বরাবর ষ্টেশনে চলিয়া গেল; সেখানে দুইটি টাকা দিয়া রামদয়ালকে একটা টেলিগ্রাম করিল। তাহার পর ডাক্তারখানা হইতে একটা ফিবার মিক্‌শ্চার আনিয়া সমস্ত রাত্রি অমরকে খাওয়াইতে লাগিল।

কিছুতেই জ্বর থামিল না। রাত্রে প্রলাপ আরম্ভ হইল।

অমর প্রলাপে শুধু বলে, "কাকীমা, আর আমি বিছানা খারাপ করব না।"

৬

প্রাতঃকালে কৃষ্ণদয়াল বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অমরের অবস্থা বড়ই খারাপ। তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; মনে হইল, কি একটা জঞ্জাল! কি করেন, সরকারী ডাক্তারকে আনিতে পাঠাইলেন। বেলা নয়টার সময়ে ডাক্তার আসিল; রামদয়ালও তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "রোগীর জীবনের আশা নাই, জীবন-দীপ নিবিবার আর বিলম্ব নাই। বেলা বারোটা পর্য্যন্তও থাকে কি না সন্দেহ।" ডাক্তার ঔষধ দিলেন। প্রলাপ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রামদয়াল একমাত্র পুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একবার অমর চমকাইয়া উঠিল; পরক্ষণেই বলিল, "কাকীমা! আর আমি বিছানা খারাপ করব না।" তাহার পরেই সব নীরব হইল। রামদয়াল অমরকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার দীপ্তিহীন নির্নিমেষ নেত্রের দিকে ব্যাকুলদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "বাপ্‌ধন অমর রে! তুইও আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেলি, আমি আর কি নিয়ে সংসারে থাক্‌বো?" অমরের ছোটকাকী বাতায়ন-অন্তরাল হইতে বিরক্তিভরে বলিলেন, "কোথাকার আপদ কোথায় এসে মরে, তার ঠিক নেই; এ পাপ বিদেয় হবে কখন!"

মোহ।

"পিসিমা, আমি তোমার কাছে আর শোব না।"

"কেন বাবা, কি হয়েছে? আমার অপরাধ?"

"তুমি মাথা ন্যাড়া কোল্লে কেন, গয়না খুলে ফেল্লে কেন, ঝির মত কাপড় পরলে কেন? তোমার কাছে আমি শোব না।"

চারি বৎসরের ছেলে পটলার অভিমান হইয়াছে! সে ত জন্মাবধি আমার এ বেশ দেখে নাই; কিন্তু সে যদি বুঝিত, পৃথিবীর লোকে যদি বুঝিত, কত দুঃখে, কত কষ্টে, কি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হ'য়ে আমি আজ এ সব ছেড়েছি! মা বাবা কাঁদিতেছেন, দাদা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে অনাহারে আফিস গেলেন; বউদিদির অমন হাসিমুখ মলিন।

সাত বৎসর বয়সের সময় বিবাহ হয়, সে দিনের কথা ভাল করিয়া মনেও পড়ে না। ছয়মাস যাইতে না যাইতেই সংবাদ আসিল, আমি বিধবা হইয়াছি। কুমারী ছিলাম; হঠাৎ একদিন বাদ্যভাণ্ড করিয়া আমাকে যাহারা সধবা সাজাইয়াছিল, আবার ছয়

মাস পরে তাহারাই ঘোর কান্নাকাটি করিয়া আমার সিঁথার সিন্দূর মুছিয়া দিল—বলিল, আমি বিধবা। নিজের ইচ্ছায় সধবাও সাজি নাই, নিজের ইচ্ছায় বিধবাও সাজিলাম না।

সাতবৎসর বয়সে বিধবা। কলিকাতা সহরে বাড়ী; বাবা হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও উদারমতাবলম্বী; দাদা তখন কলেজে পড়েন। বাড়ীতে হিন্দু চালচলন ঠিক রক্ষা হয় না। সুতরাং আমি বিধবা হইলেও বেশভূষা পরিত্যাগ করি নাই; বরঞ্চ আমার বৈধব্যের বাহ্যবিকাশ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য মা আমাকে সর্ব্বদাই সুন্দর, বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত করিতেন। আমাকে পড়াইবার জন্য মাষ্টার নিযুক্ত ছিল; বিধবা হইবার পর আমার শিক্ষার ভার বাবা ও দাদা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। আমি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার বয়স ১৯ বৎসর; এতদিন একই ভাবে যাইতেছিল,—পিতামাতার আদর, দাদার স্নেহ, বউদিদির যত্ন, পটলার আবদার—আমি এই সকল লইয়াই ছিলাম। আজ হঠাৎ আমার বেশপরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। কেন এমন কাজ করিলাম, তাহাই বলিতেছি।

২

আমার দাদা,—পৃথিবীতে এত গুণ কার? আমার দাদা শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা। দাদা আমার জন্য প্রাণ দিতে পারেন, দাদা আমার জন্য নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

আমার বয়স যখন পনর বৎসর, তখনও আমি বালিকার ন্যায় সরলা ছিলাম ; আমার মনে কোনই অভাব ছিল না। দিনরাত্রি আমোদ-আনন্দ ও পড়াশুনা করিয়াই কাটাইতাম। পড়াতেই আমার সুখ। আমি সংস্কৃত-মহাকাব্যে বিভোর থাকিতাম ; দাদার কৃপায় ভাল ইংরাজী পুস্তকও অনেক পড়িতে পাইতাম। আমার মনে হইত, পৃথিবীতে জ্ঞানানুশীলনই সুখের চরম উৎস ; আমি দেশ-বিদেশের মনীষিগণের অতুল জ্ঞানসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সংসারের শোকতাপ কিছুই অনুভব করিতে পারিতাম না।

তবে একটা অশান্তি মধ্যে মধ্যে আমাকে বড়ই কাতর করিত ;— সে দাদার বিবাহে অনিচ্ছা। দাদা এম্, এ, পাশ করিলেন ; দাদা ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ; ছোট আদালতে বাহির হইলেন। তখন দাদার বয়স ২৭ বৎসর। কিন্তু দাদাকে কেহ বিবাহে সম্মত করিতে পারিল না ; কেহ বিবাহের প্রস্তাব করিলেই দাদা বলিতেন, "এতদিন ত বাপের পয়সাই ব্যয় করিতেছি ; নিজে দশটাকা আনিতে শিখি, তখন বিবাহ করিবার কথা ভাবিয়া দেখা যাইবে।" আমাদের অবস্থা এমন নয় যে, দাদা দশটাকা না আনিতে পারিলে সংসার অচল হয়। বাবা স্মিথ কোম্পানীর হেড কেশীয়ার ; তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতে আমাদের সংসার চলিয়া যায়, বরং কিছু কিছু সঞ্চিত হয়। তাহা ছাড়া পিতামহের আমলের কিছু কোম্পানীর-কাগজ আছে ; বাড়ীখানি আমাদের নিজের। চোরবাগানে আরও একখানি বাড়ী আছে ; তাহার ভাড়াও নিতান্ত কম নহে। সুতরাং সাংসারিক অস্বচ্ছলতা আমাদের মোটেই ছিল

না। কিন্তু দাদার সেই এক কথা,—"দশটাকা আনিতে না শিখিলে বিবাহের কথা ভাবিবার সময় হইবে না।" এই জন্য মধ্যে মধ্যে আমাদের একটু কষ্ট হইত। আমার ইচ্ছা, দাদার একটি বেশ সুন্দর বউ আসিবে, সে আমার সঙ্গিনী হইবে, আমি তাহাকে কত সুন্দর পুস্তক পড়াইব; যখন একলা বসিয়া থাকিব, তখন সে আমার সঙ্গে গল্প করিতে আসিবে। দাদা এ সব কথা একেবারেই বুঝিতে চান না।

শেষে এ আপত্তি আর টেঁকে না। দাদার বেশ পশার হইয়াছে,—মাসে যেমন করিয়া হউক দাদা দুইশত টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি একদিন বলিলাম, "দাদা! মাসে দুইশত টাকা ত বড় কম টাকা নহে; দুই শত টাকায় কি একটা বউয়ের ভরণপোষণ চলে না?" দাদা আমার কথার কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার মুখ যেন মলিন হইয়া গেল। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণভাবে সেখান হইতে উঠিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার সময়ে ছাদে বেড়ান আমার কেমন একটা অভ্যাস। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাদে উঠি, দুই এক ঘণ্টা রাত্রি না হইলে আর ছাদ হইতে নামি না। নীল আকাশ দূরবিস্তৃত, আকাশের কোলে একখণ্ড শুভ্র মেঘ, মেঘের আশেপাশে পথহারা দুই একটা পাখী, এই সকলে মিলিয়া আমার স্বপ্নরাজ্য প্রস্তুত করিয়া দিত; আমি সেই নীল-আকাশতলে বসিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম।

একদিন সন্ধ্যার পরে ছাদ হইতে নামিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে বাবার ঘরে কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তবুও বাবার ঘরে আলো দেয় নাই,—অন্ধকারেই কথাবার্ত্তা হইতেছে। স্বরে বুঝিলাম, ঘরের মধ্যে মা, বাবা, দাদা, তিনজনেই আছেন। অন্ধকারের মধ্যে তিনজনে এমন কি গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ করিতেছেন, জানিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। আমি দ্বারের পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম।

দাদা বলিতেছেন, "আমি বিবাহ করিতে পারিব না। এ বাড়ীতে আবার বিবাহের আমোদ! কমল চিরজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর আমি বিবাহ করিয়া সুখে ঘর করিব, তাহা হইতেই পারে না। কমলের জীবন যে ভাবে যাইবে, আমার জীবনও সেই ভাবে কাটিবে।" বাবা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "নলিন, তোমার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। ইহার উপর আমার মতামত প্রকাশ করা বড়ই কঠিন।" মা বলিলেন, "তবে কি আমার অদৃষ্টে সুখ নাই? সোণার মেয়ে কমল, তার এই অদৃষ্ট; তার পর তোমার এই পণ। আমার কি আর সাধ-আহ্লাদ করিতে ইচ্ছা হয় না? না বাবা, এমন ইচ্ছা করিও না। বিবাহ কর, বউ আসুক। আমার কমলও তাতে সুখী হইবে। কমল আমার কোথাও যায় না, কাহারও সঙ্গে মেশে না। যদি একটা বউ আসে, তবে তার সঙ্গে গল্প, আমোদ-আহ্লাদ করে তার জীবনটা বেশ কেটে যেতে পারে।"

এমন সময়ে তামাক্ লইয়া হরিদাসকে আসিতে দেখিয়া আমি

নিঃশব্দে ছাদে চলিয়া গেলাম। সেখানে সেই অন্ধকার-রাত্রে একাকিনী বসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। আমার দাদা সত্য-সত্যই দেবতা। এমন করিয়া কে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে? আমার দুঃখ কি? আমি ত বেশ আছি। ইহাতেও দাদার মন উঠে না কেন? দাদা বিবাহ করিয়া সুখী হইলে আমার ত আনন্দই বাড়িবে। বউদিদিকে কত আদর যত্ন করিব;—শেষে যখন দাদার ছেলে কি মেয়ে হইবে, তখন তাহাদের লালনপালন করিয়া আমার দিন সুখে কাটিয়া যাইবে। দাদার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। আজ দাদার সঙ্গে মহা তর্ক করিব।

দাদা, বলিলেন, আজ তুই যে ভাবে বস্‌লি, তাতে দেখ্‌ছি বিপুল অয়োজন! মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি দুই-একখানি অমোঘ অস্ত্র বার করব নাকি?”

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, “না দাদা, সে সব অস্ত্রে চলবে না। বঙ্কিম বাবুর দাম্পত্য-দণ্ডবিধির ধারা লইয়া তর্ক।”

দাদার মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি গম্ভীর হইয়া বসিলেন। আমি বলিলাম, “দেখ দাদা, তোমরা এই একটু আগে যে সব কথা বলাবলি করছিলে, আমি সে সব শুনেছি—সব না শুন্‌লেও তোমার শেষ বক্তৃতা আমি শুনে ফেলেছি।”

দাদা আমার মুখের দিকে কাতরদৃষ্টিতে চাহিলেন; আমিও থামিয়া গেলাম। কথাটা পাড়িয়াছি, কিন্তু এখন কেমন করিয়া অগ্রসর হইব, তাহার যো পাইতেছি না। শেষে হঠাৎ বলিয়া বসিলাম, "দাদা, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।" কথাটা বেশ দৃঢ়তার সহিতই বলিলাম। স্থির করিলাম, যুক্তি-তর্ক করিব না, বিচার-বিতণ্ডা মোটেই করিব না; আমি জোর করিয়া দাদাকে বিবাহ করাইব। আমি দাদার অতুল স্নেহের অধিকারিণী; সেই স্নেহের খাতিরে দাদা আমার কথা ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবেন না। দাদা চুপ করিয়া রহিলেন, কোনও জবাবই দিলেন না। আমি আবার অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।"

এইবার দাদা উত্তর করিলেন, "কাজটা কি বড় সহজ মনে করলে, কমল!"

আমি। সহজ?—এমন কঠিন কাজ কেহ কখন করে নাই; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়োদের মধ্যে তুমিই এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাচ্চ। বাপ রে, বিয়ে করা কি সহজ কাজ!

দাদা। কমল, তুমি কথাগুলি মোটেই তলিয়ে বুঝলে না।

আমি। তা, আমার না হয় বুঝিবার শক্তি নাই। অবুঝ ছোট বোনের অনুরোধ;—না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে। তুমি যদি এই মাসের মধ্যে বিবাহ না কর, তাহা হইলে ভাল হইবে না। যে জন্য তুমি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, তাহা আমি শুনিয়াছি। এখন আমার কথা শোন;

এই বৈশাখ মাসের মধ্যে যদি তুমি বিবাহ না কর, তাহা হইলে ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে যেমন করিয়া হয় আমি মরিব। ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা!"

আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে গৃহান্তরে চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া দেখি, দাদা টেবিলের উপর মাথা দিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমি দাদার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম, অতি মৃদুস্বরে ডাকিলাম, "দাদা!"

দাদা মুখ তুলিয়া চাহিলেন; তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। আমি বলিলাম, "দাদা, ভালর জন্যই আমি তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি; আমার জন্য তুমি তোমার জীবনের সুখ নষ্ট করিবে? তোমার কাছে আমার কিছুই গোপনীয় নাই। তুমি শুধু আমার দাদা নও; আমার খেলার সাথী, আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। দাদা, তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমার ত কোন দুঃখ নাই। তোমার মত দাদা যার আছে, তার দুঃখ কি? দাদা, আমার কথা শোন, বিবাহ কর। আমার মরণ যদি না দেখিতে চাও, তবে বিবাহ কর।"

দাদা বুঝিলেন, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তিনি বলিলেন, "কমল, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছু করিব না। কিন্তু এখনও ভাবিয়া দেখ, কাজটা ভাল করিলে না।"

"আমি বেশ ভাবিয়া দেখিয়াছি; আমার জন্য তুমি এমন কাজ করিতে পারিবে না।"

দাদা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কমল, তোমার

যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। তোমার কথা এড়াইবার সাধ্য আমার নাই।”

৪

বৈশাখ মাসেই দাদার বিবাহ হইয়া গেল। বউদিদি সকলেরই মনের মত হইলেন। আমার যে কত আনন্দ হইল, তাহা আর বলিবার নহে। একবৎসর পরেই দাদার খোকা হইল—আমার কাজ বাড়িল। এখন আর পড়াশুনায় তেমন আগ্রহ রহিল না; দিন-রাত্রি শুধু খোকাকে লইয়া থাকি। আমিই আদর করিয়া তাহার পটলা নাম দিলাম।

এই সময়ে একদিন আমার যেন কি হইল। কেন হইল, তাহা জানি না; তবে কিসে কি হইল, তাহা বলিতে পারি। এক-দিন অপরাহ্ণে আমি দাদার ঘরের সম্মুখ দিয়া ছাদে যাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ চাহিয়া দেখি, ঘরের মধ্যে দাদা আর বউদিদি। দাদা আদর করিয়া বউদিদির চিবুক ধরিয়া মুখচুম্বন করিতেছেন। এ দৃশ্য আমি কখনও দেখি নাই, আমার চক্ষে ইহা কখনও পড়ে নাই। হতভাগিনী আমি; এই দৃশ্য দেখিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল; আমার প্রাণের ভিতর দিয়া কি যেন একটা বহিয়া গেল। আমার সমস্ত হৃদয়ের নির্ব্বাপিতপ্রায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেন জাগিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি ছাদে গেলাম। পূর্ব্বের মত চারিদিকে চাহিয়া, আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া সেই দৃশ্য ভুলিতে চাহিলাম; কিন্তু আমি যতই চেষ্টা করি, ততই যেন সেই দৃশ্য আমার সম্মুখে আসিয়া

উপস্থিত হয়। আমার প্রাণের অতৃপ্ত-বাসনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। আমার এই উনিশ বৎসর বয়সের মধ্যে একদিনও যে ভাব আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই, আজ সেই বাসনা আমাকে আচ্ছন্ন করিল। আমি এক মুহূর্ত্তে যৌবনের সাধ-বাসনার দাস হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, কি পাপে আমার এ শাস্তি? এমন করিয়া আদর করিবার আমার যে কেহ নাই! জীবন যেন বৃথা বোধ হইতে লাগিল; দারুণ পিপাসায় আমার ছাতি ফাটিতে লাগিল। সাত বৎসরের সময় বিধবা হইয়াছি; জীবনের কোন সুখেরই আস্বাদ পাই নাই; আজ আমার লালসাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আকাশে—সেই অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাহাতেও যেন আমার অতৃপ্ত-বাসনা, আমার যৌবন-কামনার স্রোত বহিয়া যাইতেছে; সান্ধ্যপবনহিল্লোল যেন কোথা হইতে যৌবনের অতৃপ্তি আনিয়া আমার গায়ে ঢালিয়া দিতে লাগিল। শুধু মনে হইতে লাগিল, আমায় সোহাগ করিবার কেহ নাই। মায়ের স্নেহ, পিতার আদর, দাদার অপরিমেয় ভালবাসা, সব যেন সামান্য বোধ হইতে লাগিল। রমণীর যাহা সর্ব্বস্ব, যৌবনের যাহা কামনা, সেই আদর, সেই ভালবাসার জন্য আমার তৃষিত-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—আমার সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আজ আঠার বৎসর যে চিন্তা কোনদিন আমার মনে উদিত হয় নাই, আজ নূতন করিয়া তাহা মনে হইল;—বোধ হইল, জীবন বৃথায় গেল, কোন সাধ, কোন বাসনাই পূর্ণ হইল না। আমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

৫

আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়াই একটা গলি গিয়াছে। গলির অপর পার্শ্বে সরকারদিগের বাড়ী। এতদিন তাহারা এই বাড়ীতেই বাস করিত; কিন্তু এই সময়ে তাহাদের অবস্থা মন্দ হওয়ায় তাহারা শ্যামবাজারে একটা ছোট ভাড়াটিয়া-বাড়ীতে উঠিয়া গেল। তাহাদের বাড়ী স্কুল-কলেজের ছেলেরা ভাড়া লইয়া 'মেস্' করিল। আমাদের ছাদে উঠা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু আমার এতকালের অভ্যাস, আমি সন্ধ্যার পরে ছাদে না উঠিয়া থাকিতে পারিতাম না। সন্ধ্যার পরেও মেসের ছেলেরা ছাদে বসিয়া নানা-বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিত, কিন্তু তাহাতে আমার কোন প্রকার লজ্জাবোধ হইত না।—আমি ছাদের একপাশে বসিয়া কখনও বা তাহাদের তর্কবিতর্ক শুনিতাম, কখনও বা আপন মনে বসিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতাম।

সরকারদের তেতালায় সবে একটি ঘর। ঘরটি খুব ছোট। সেই ঘরে সোনার চশমা-পরা, দিব্য ফুটফুটে গৌরবর্ণ একটি ছাত্র থাকিতেন। তাঁহার সেই ঘরের পশ্চিমদিকের জানালা খুলিলে আমাদের ছাদ বেশ দেখা যাইত।

ছাত্র মহাশয়েরা পৃথিবীর সমস্ত বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন নীচে নামিয়া যাইতেন, তখন ঐ ছাত্রটি ধীরেধীরে সেই তেতালার ঘরে প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদিকের জানালা খুলিয়া দিতেন; তাহার পর টেবিলের উপরের কেরোসীন-ল্যাম্পটি জ্বালিয়া

একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিতেন। পড়িতে পড়িতে যখন ক্লান্তিবোধ হইত, তখন কখনও বা বই-হাতে ছাদে আসিয়া পাইচারী করিতেন, কখনও বা পশ্চিমদিকের সেই জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। জ্যোৎস্নারাত্রে আমি খুব কমই ছাদে বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে আমি ছাদে বসিয়া সেই ছাত্রটির সুন্দর মুখখানি দেখিতাম। তিনি যখন পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইতেন, আমি তখন হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম। কেমন শিষ্ট শান্ত, কেমন নম্রপ্রকৃতি! ছাদে যখন ছাত্রগণের পার্লিয়ামেণ্ট বসিত, এবং তাহাতে বার্ডসায়ের মূল্য হইতে আরম্ভ করিয়া থিয়েটার, কংগ্রেস, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট, টেনিসন, সেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, ভারতী প্রভৃতি হরেক-রকমের আলোচনা হইত, তখন ঐ তেতালার ছাত্রটি কিন্তু তাহাতে যোগ দিতেন না। আমি দেখিতাম, তিনি একপার্শ্বে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি চিন্তা করিতেন? তাঁহার ঐ ভাবটি আমার বড়ই ভাল লাগিত। আমার মনে হইত, এই ছাত্রটি ঠিক আমারই মত মানুষ; আমি যেমন এখন দিনরাত্রি বসিয়া ভাবি, ইঁহারও তাহাই। কিন্তু তিনি কি ভাবেন, কে জানে?

এমন করিয়া কতদিন যাইবে? শেষে তেতালার ছাত্রটি আমাকে দেখিয়া ফেলিলেন। একদিন হঠাৎ আমাদের চারিচক্ষুর মিলন হইল; তিনি অমনি মুখ নত করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমি ছাদেই বসিয়া রহিলাম। আমার হৃদয়ের মধ্যে

কি যেন একটা বহিয়া গেল। ইহার পর হইতে যখন ছাদে অন্য ছাত্রেরা থাকিত, তখন আমি মোটেই উপরে যাইতাম না। সকলে চলিয়া গেলে আমি চোরের মত ছাদে যাইয়া বসিতাম; কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে তিনি আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেন না, আমি তাঁকে বেশ দেখিতে পাইতাম।

শেষে আমি যেন অধীরা হইয়া উঠিলাম। দিনের বেলায়, দ্বিপ্রহরে পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, কখন তিনি কলেজ হইতে ফিরিবেন। যখন দেখিতাম, তিনি সেই রৌদ্রতপ্ত রাজপথ বহিয়া মেসে আসিতেছেন, তখন আমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। আমি চুপেচুপে সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে ছাদে উঠিতাম এবং তাঁহাকে দেখিতাম। প্রথম প্রথম তিনি যেন কেমন অপ্রতিভ ও মলিন হইয়া যাইতেন; তাহার পর ক্রমে তাঁহার সে সঙ্কোচ চলিয়া গেল। আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল,—অতি গোপনে, অতি সাবধানে!

৬

এমন করিয়া আর কতদিন চলে? শেষে দুইজনে ছাদে বসিয়া পরামর্শ আঁটিলাম, পলায়ন করিব। আমার তখন মনে হইত, এমন করিয়া স্বর্গের দ্বারে তৃষিত অবস্থায় বসিয়া থাকি কেন? একটু সাহস করিলেই ত নরেন্দ্রনাথ চিরজীবনের মত আমার হইয়া যায়—আমার সব-বাসনা পূর্ণ হয়।

পলায়ন স্থির হইল। আমি কিছুই লইয়া যাইব না, টাকাকড়ি,

গহনাপত্র কিছুই লইব না। দরকার কি ? যে স্বর্গসুখের অধীশ্বরী হইব, তাহার নিকট টাকাকড়ি কি ছার !

গতকল্য রাত্রি ৯ টার সময়ে একখানি সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ী আসিয়া আমাদের গলির মোড়ে দাঁড়াইল ; আমি অন্যের অজ্ঞাতসারে খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিলাম—গাড়ীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ।

আমি নরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম। নরেন্দ্রনাথ গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, এবং গাড়োয়ানকে হাবড়া ষ্টেশনে যাইতে হুকুম দিল। তাহার পর—তাহার পর—সে পাপ কথা বলিতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে,—তাহার পর নরেন্দ্রনাথ আমার মুখচুম্বন করিল। সেই মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল ; আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ; আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় যেন বিষের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমার মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি সজোরে তাহার মুখ সরাইয়া দিলাম ; হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একীভূত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। গাড়োয়ান ভীত হইয়া হঠাৎ গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া লাফাইয়া পড়িলাম। একেবারে রাস্তার উপরে পড়িয়া গেলাম ; “কি কর, কি কর !” বলিয়া নরেন্দ্র—সেই পিশাচ—গাড়ী হইতে নামিতে গেল ; আমি এক ধাক্কায় তাহাকে পথের উপর ফেলিয়া দিয়া যে দিক হইতে গাড়ী আসিয়াছিল, সেই দিকে ছুটিতে লাগিলাম। পথে তখন লোক ছিল না। একটু যাইতেই পথ

চিনিলাম, আমাদের বাড়ী হইতে বেশী দূরে যাই নাই। সম্মুখে দেখি, কে যেন আসিতেছে; তখন মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া জড়সড়ভাবে পথের একপার্শ্বে দাঁড়াইলাম। লোকটি আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল। আমি আবার চলিতে লাগিলাম। একটু গিয়াই আমাদের গলির মোড় পাইলাম! তখন এক দৌড়ে আমাদের খিড়কীতে প্রবেশ করিয়া দরজা রুদ্ধ করিয়া দিলাম। কেহই কিছু জানিতে পারিল না।

সমস্ত রাত্রি যে আমার কি যন্ত্রণায় কাটিল, তাহা বলিতে পারি না। আমার মনে হইল, কে যেন আমার ওষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। আমার মুখ যে পুড়িয়া গেল! হায়! ইহারই নাম সুখ, ইহারই নাম প্রেম! কে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আমার ওষ্ঠে মাখাইয়া দিল? একবার মনে হইল, গলায় দড়ি দিয়া এ জীবন শেষ করি। কিন্তু পারিলাম না। কেন পারিলাম না? তাহা হইলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কৈ? যত দিন বাঁচিব, তত দিন আমার এমনই করিয়া সমস্ত মুখ অদৃশ্য অগ্নিতে পুড়িতে থাকিবে—চিরজীবন আমি অন্যের অগোচরে ধিকিধিকি করিয়া তুষানলে দগ্ধ হইব, তবে ত আমার প্রায়শ্চিত্ত! আমি সেই প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিলাম। মরা হইল না।

আর আমার এই রূপ—ইহাই আমার কাল। কা'ল রাত্রে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বিলাস ত্যাগ করিব, রূপের বাসায় আগুন লাগাইয়া দিব। তাই আজ প্রাতেই আমার সেই নরকের সঙ্গী কেশপাশ কাটিয়া ফেলিয়াছি, অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছি,

সাদা কাপড় পরিয়াছি। ছয় মাস অন্ন গ্রহণ করিব না ; সামান্য ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিব।

মা-বাবা কাঁদিতেছেন, দাদা কাঁদিতেছেন, বউদিদি বিষণ্ণ, পটলা আমার এ পরিবর্ত্তনে কাতর, কিন্তু আমার যে কি যন্ত্রণা—সমস্ত মুখটা পুড়িয়া যাইতেছে। হা ভগবান!

ডিপুটী বাবু।

কত কষ্টে যে শশীকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলাম, তাহা ভগবান জানেন ;—অনাহারে থাকিয়া, এক বেলা একপেট আহার করিয়া শশীর পড়ার খরচ যোগাইয়াছি ;—শশী এখন ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট।

শশী আমার একমাত্র কনিষ্ঠ। বাবা যখন মারা যান, তখন আমি ঢাকা-কলেজের দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি ; শশী সেবার প্রবেশিকা-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

আমাদের বাসগ্রাম মধুখালির বাজারে বাবার একখানি কাপড়ের দোকান ছিল। সেই দোকানের আয় হইতে আমাদের সংসার চলিত, এবং বাবা মাসে মাসে আমাদের দুই ভাইয়ের পড়ার খরচ ২৫৲ টাকা দিতেন। বাবা যখন মারা গেলেন, তখন দোকানের গোমস্তা হিসাব করিয়া বলিল, আমাদের দোকানে বিস্তর ধার, প্রায় আট হাজার টাকা। দুই চারি দিনের মধ্যেই পাওনাদারেরা আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল ; দোকানপাট বিক্রয় হইয়া গেল ; পাওনাদারগণ দয়া করিয়া আমাদের ভদ্রাসনখানিতে আর হাত দিলেন না।

আমাদের পরীক্ষার আর তিন মাস বাকী। মা বলিলেন, তিন মাসের জন্য কি আমার পড়া ছাড়া ভাল হয়। যেমন করিয়া হউক, তিন তিন মাস চালাইয়া লইবেন। মার গায়ে কয়েকখানি অলঙ্কার ছিল ; সেই পাঁচ সাত শত টাকার অলঙ্কারের ভরসাতেই মা এমন কথা বলিলেন। মায়ের বিক্রীত অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে একদিন তাঁহাকে সংবাদ আনিয়া দিলাম যে, আমি ফেল করিয়াছি, শশী দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছে।

বাড়ীতে পরিবার বেশী নয়। আমরা দুটি ভাই, মা আর আমার স্ত্রী ; বাবা আমার পরিণয়-সংস্কার যথাসময়েই নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। চাকর-চাকরাণী যাহারা ছিল, বাবার মৃত্যুর পরেই মা তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন।

২

বসিয়া খাইলে রাজার রাজত্বে কুলায় না, মায়ের আর কখানিই বা অলঙ্কার। এল এ ফেলের চাকুরীও বড় সহজে মিলে না। শশীর পড়ার কোনই বন্দোবস্ত হইল না ; ইহার উপর গৃহে আবার আমার পত্নী সন্তান-সম্ভাবিতা। আমি ঘোর বিপদে পড়িলাম।

আমার দুঃখ দেখিয়াই হয় ত ভগবান আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। আমাদের গ্রামের মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার মোক্তারী পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য ছয়মাসের বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহারই অনুরোধক্রমে আমি হেডমাষ্টার হইলাম। বেতন খাতায় রহিল ত্রিশ টাকা ; আমাকে ত্রিশ টাকাই সহি করিতে হইবে,

কিন্তু আমি পাইব বাইশ টাকা ; পূর্ব্বের হেডমাষ্টারের সঙ্গে স্কুলের কর্ত্তাদের এই প্রকারই বন্দোবস্ত ছিল ; কিন্তু বাইশ টাকাও আমার হস্তগত হইবে না। ভবিষ্যতে মোক্তার হইবার আশায় বিদায়-প্রাপ্ত হেডমাষ্টার বলিলেন, তাঁহাকে চারিটি করিয়া টাকা দিতে হইবে, নতুবা তিনি আমা অপেক্ষা যোগ্যতর লোককে তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়া যাইবেন। তথাস্তু ; স্কুলের খাতায় ত্রিশ টাকা লিখিয়া নগদ সতর টাকা পনর আনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত,—চারিটি পয়সা রসিদ-ষ্ট্যাম্পের দাম।

শশী বলিলেন, পনর ষোল টাকার কমে তাঁহার ঢাকার খরচ চলিবে না। আমিও তাহাই স্বীকার করিলাম। আঠার টাকা বেতনের ষোলটি টাকা ভাইয়ের পড়ার খরচ দিতাম ; বাকী এক টাকা পনর আনায় সংসার চালাইতে হইত। না হয় উপবাস করিব, কিন্তু তা বলিয়া ত শশীকে মূর্খ করিয়া রাখিতে পারি না।

পল্লীগ্রামে আয়ের অন্য উপায় নাই। অগত্যা আমার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিলাম ; সমস্ত ব্যবস্থা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। আমার স্ত্রী বড়-মানুষের মেয়ে নহেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা। বিবাহের সময় আমার শ্বশুর আমার স্ত্রীকে প্রায় হাজার টাকার অলঙ্কার দেন, আমার পিতাও সেই সময়ে পাঁচ ছয় শত টাকার অলঙ্কার দেন। এই দুরবস্থায় পড়িয়া আমার স্ত্রী বলিলেন "তোমার ভয় কি ? স্কুলের বেতনের টাকাটা সবই ঠাকুরপোকে দাও। ঠাকুর-পো যতদিন পড়িবে, ততদিন আমরা আমার গায়ের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইব। ঠাকুর-পো যদি ভাল

করিয়া পাশ হইতে পারে, তাহার বড় চাকুরী মিলিবে ; তখন দেড় হাজার কেন, তিন হাজার টাকার অলঙ্কার গড়াইয়া লইব।"

আমার স্ত্রীর গায়ে একখানিও অলঙ্কার নাই, পাঁচ বৎসর শশীকে পড়াইতে ও সংসার চালাইতে প্রায় দেড় হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। আমার স্ত্রী অম্লানবদনে আমার বুকের পাঁজরার মত একএকখানি করিয়া অলঙ্কার বাহির করিয়া দিয়াছেন, আর আমি দীর্ঘনিশ্বাস বুকে চাপিয়া তাহা বাজারে বেচিয়া সংসার-খরচ চালাইয়াছি। আমার একমাত্র আদরিণী কন্যা সুপ্রভার গায়ে একখানি অলঙ্কারও নাই। পাঁচ বৎসরের মেয়ে দুইগাছি কাচের চুড়ী হাতে দিয়াই থাকিত। পাড়ার লোকে কিছু বলিলে আমার স্ত্রী গম্ভীরভাবে বলিতেন, "আর দুদিন যাক না, ওর কাকা ওকে সোণায় ঢাকিয়া দিবেন ; চিরদিন কারও সমান যায় না।"

১৮৯৩ সালে শশী ডিপুটী-পরীক্ষায় পাশ দিলেন। সেই বৎসরই কলিকাতার এক বড়-মানুষের মেয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহ করিয়া স্ত্রী-সঙ্গে শশী একবারমাত্র দেশে আসিয়াছিলেন। বধূমাতা আমাদের গরীবের সংসার দেখিয়াই নাসা-কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওমা, একি ভদ্দোরলোকের বাড়ী গা ? এ জঙ্গলে কি মনিস্যি বাস কত্তে পারে ?"—তিন দিন পরে বধূমাতাকে লইয়া শশী পৈত্রিক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিলেন,

তাহার পর এই আট বৎসর আর তিনি বাড়ীতে আসেন নাই।

প্রথম ডিপুটী হইয়া শশী মাসে যে টাকা পাইতেন, তাহা যৎসামান্য; তাহাতে একজন পদস্থ ভদ্রলোকের সম্মান বাঁচাইয়া বাস করাই অসম্ভব। ছয় মাস পরেই শশী পাকা ডিপুটী হইলেন। আমি সেই স্কুল-মাষ্টারই আছি; তবে সৌভাগ্য এই যে, এখন আর আঠারো টাকা পাই না। এখন আমার বেতন ২৩ টাকা। শশীর পড়ার খরচের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় এই টাকাতেই আমাদের সংসার চলিয়া যাইতেছে।

শশীকে আমি কোন দিন টাকার জন্য লিখি নাই। আর লিখিবই বা কেন? কি ভাবে শশীকে পড়াইয়াছি, তাহা কি সে জানে না? সুবিধা পাইলেই শশিভূষণ আমাদের অবস্থার উন্নতি করিবে; সে চিন্তা তাহারই আছে। একমাত্র কন্যা সুপ্রভা; তাহার বিবাহেরই বা ভাবনা কি? তাহার যে রাজার মত কাকা বর্ত্তমান। মনে করিয়াছিলাম, শশী আর একটু ভাল করিয়া বসিলে, তাহার আর দুই এক গ্রেড পদোন্নতি হইলে আমি এ ছাই রাখালী ছাড়িয়া দিব। শশীর মত যাহার ভাই, তাহার আবার ভাবনা কি?

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধাতা করেন আর এক। সাত বৎসর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ বি, এ, মহাশয় ডিপুটী হইয়াছেন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে কাজকর্ম্মে যথেষ্ট সুনামও হইয়াছে; কিন্তু তিনি যে মধুখালীর মাইনর-স্কুলের তেইশ-টাকা বেতনের হেড-

মাষ্টার বিধুভূষণ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্বর্গীয় রামব্রহ্ম ঘোষের পুত্র, সে কথা শ্রীমান্ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। ডিপুটী হওয়ার পর প্রথম দুই একবৎসর আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। কি করিব, আমার প্রাণের টান! আমি যে আমার বুকের রক্ত ঢালিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছি। তাহার উপেক্ষায় কি আমার স্নেহ শুকাইয়া যাইবে? আমি শশীর সাহায্যপ্রার্থী নহি, কিন্তু তাহার গৌরবে পুলকিত না হইব কেন? তাহাকে দেখিলে আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। কিন্তু শশীর বাসায় গিয়া তেমন আমল পাইতাম না; তাহার শ্যালক, শ্যালক-পুত্র, শ্যালিকা-পুত্র, মামা-শ্বশুর প্রভৃতি নিকটতম কুটুম্ববর্গ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে! আমি তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর; আমি সেখানে আমল পাইব কেমন করিয়া। কুটুম্ব-মহাশয়েরা আমার যাতায়াতটা বড়ই প্রতিকূল চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। একদিন শুনিলাম বধূমাতা দাসীর নিকট মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, "বাড়ী-ঘর-দোর ফেলে এখানে নিত্যি-নিত্যি মোড়লি করতে আসা কেন? আমরা ক-দিন ওঁর দোরে পাতড়া মারতে যাই!" বড়লোকের মেয়ের কি ইতর মনোবৃত্তি! হায় স্বামীসোহাগিনী, তুমি কিরূপে জানিবে যে, এক-দিন সংসারে দাদা ভিন্ন শশীর আর কেহ ছিল না। সেই শশী আজ সকল পাইয়াছে, তাই দাদার আত্মীয়তা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে!

আচ্ছা, তাহাই হউক। আমি শশীর গৃহে যাতায়াত বন্ধ করিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, শশীর কাছে আর

যাইব না। আমার স্ত্রীর মুখে আর কথা নাই ; তাঁহার আশা-পূর্ণ হৃদয়ের সকল বিশ্বাস চলিয়া গেল, ইহাই আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করিলাম। আমি পুরুষ ; এ কঠোরতা সহ্য করিবার সামর্থ্য আমার ছিল ; কিন্তু সেই সর্ব্বস্বত্যাগিনী দেবর-গর্ব্বিতা সরলার মনে এখন কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ?

তবুও সৌভাগ্য যে শশীর এই ব্যবহার দেখিবার জন্য মাতা-ঠাকুরাণী বাঁচিয়া নাই ; শশীর পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।

৪

মেয়েটী আর ঘরে রাখা যায় না ; বার বৎসর বয়স, তাহার পর শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট। আমাদের একমাত্র সাধের সন্তান সুপ্রভা ; তাহাকে কেমন করিয়া যার-তার হাতে ধরিয়া দিব। কিন্তু ভাল ছেলে পাইতে হইলে টাকার দরকার। গরিব স্কুল-মাষ্টার, ২৩ টাকা বেতন পাই। তিন চারি হাজার টাকা কোথায় পাইব ! আর এক বিপদ হইয়াছে, যেখানে সম্বন্ধ করিতে যাই, সেখানেই শশীর পরিচয় হইয়া যায়। ডিপুটী-বাবুর ভাইঝি বলিয়া সকল বরের বাপই দর বাড়ায় ! ডেপুটীর ভাইঝিই বটে ! কিন্তু আমি নীরব থাকি ; শশীর নিন্দা কেমন করিয়া করিব, তাহার বিরুদ্ধে একটী কথা বলিতে যে আমার বুক ফাটিয়া যায়। বড় কষ্টে আজ এ কথা বলিতে বসিয়াছি।

বেতন যাহা পাই, তাহাতে অতি কষ্টে সংসার চলিতেছে বটে, কিন্তু মেয়ে যে আর ঘরে রাখা যায় না। কষ্টে পড়িলে মনুষ্যের,

আমাদের মত দুর্ব্বল, অক্ষম, অধম মনুষ্যের সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া যায়; —মর্ম্মাহত আত্মসম্মান ও পৌরুষ-গর্ব্ব একদিন নিতান্ত তুচ্ছ ভাবিয়া যাহার উপর সবেগে পদাঘাত করে, অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাহাই আবার আর একদিন অবলম্বন-দণ্ডের ন্যায় গ্রহণ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠে।

বহুদিনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলাম। আমি অভাবে পড়িয়া কন্যাদায় জানাইয়া আমার সহোদর ভ্রাতা, আমার একমাত্র স্নেহের কনিষ্ঠ শশীকে পত্র লিখিলাম। শশী যে সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছে, এখনও আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। স্নেহান্ধ মূঢ় পদেপদে এমনই নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে!

যাহাহউক, পনর দিন পরে একখানি মনিঅর্ডার পাইলাম; জবাবে আর পত্র পাইলাম না। মনিঅর্ডারের কুপনে ঠিক এই কয়টি কথা লেখা আছে:—

'পত্র পাইলাম। সুপ্রভার বিবাহের সামান্য সাহায্য কুড়িটী টাকা পাঠাইলাম। ইহার অধিক দানের আমার সুবিধা নাই।

শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।"

মাসে চারি শত টাকা বেতনভোগী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশিভূষণ ঘোষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায়-বাহাদুর আমাকে ঐ পত্রখানি লিখিয়াছেন। আমার কন্যার বিবাহের জন্য তিনি কুড়িটী টাকা 'দান' করিয়াছেন—ভিক্ষা দিয়াছেন। পত্রে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেও বোধ করি অসম্মান বোধ করিয়াছেন। ইহা

সঙ্গতই বটে; তিনি একটী সবডিবিজানের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা —মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি, আর আমি মধুখালী নামক ক্ষুদ্রপল্লীর সামান্য শিক্ষক, অশিক্ষিত, অবজ্ঞাত অভদ্র।—সামান্য স্কুলমাষ্টার কি ডিপুটির দাদা হইতে পারে না?

যাহা হউক, পরে জানিতে পারিলাম, শশী যে অপাত্রে দানের সুবিধা পান নাই সে কথা সত্য; কারণ বধূমাতার ইচ্ছা তাঁহার কনিষ্ঠা-সহোদরা কনকমঞ্জরীর বিবাহে তাহাকে একজোড়া হীরার বালা উপহার প্রদানপূর্ব্বক পিতৃগৃহে প্রশংসালাভ করেন। সে জন্য শ্রীমানের দুইমাসের বেতন 'হ্যামিল্টন' কোম্পানীর তহবিল-জাত হইয়াছে। এ অবস্থার সকলেই শশীর নিঃস্বার্থ দানবত্তার প্রশংসা করিবেন, সন্দেহ কি?

আমার অভিমানিনী পত্নী শশীর সেই প্রথম ও শেষ দান গ্রহণ করিলেন না।

সুপ্রভার বিবাহ আজও দিতে পারি নাই। এখন কেবল ভগবানের করুণায় বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছি। তিনিই নিরা-শ্রয়ের আশ্রয়!

প্রায়শ্চিত্ত।

—:০:—

১

পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বের ও আজিকার বাঙ্গালা, এ উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। বাঙ্গালী-জীবনও এখন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। "না জাগিলে যত ভারতললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"—এই মর্ম্মের গান তখন পথেঘাটে শুনিতে পাইতাম। একদিকে ব্রাহ্মসমাজের যেমন উৎসাহ ছিল, অন্য দিকে গীতাও তেমনই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তখনও ইংরাজের অনুকরণের মোহ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইংরাজীশিক্ষিত হরিশ্চন্দ্র সান্যাল যে Mr. Horace C. Sandell নামগ্রহণ পূর্ব্বক হ্যাট-কোট ও টাই-কলারের সম্মানরক্ষা করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ ছিল না। হোরেস্ স্যাণ্ডেল সাহেবকে যাহারা নামেমাত্র জানিত, তাহারা তাঁহাকে জন-বুষেরই বংশাবতংশ বলিয়া মনে করিত। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিল, ডেপুটী সাহেবের বর্ণ ও বাক্য হইতে তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তিনি নেটিভ-ক্রিশ্চিয়ান।

ডেপুটী সাহেব কখনও শ্বেতদ্বীপে পদার্পণ না করিলেও তাঁহার সাহেবিয়ানার ত্রুটী এ দেশের সাধারণ সাহেব বা বাঙ্গালীর চক্ষে ধরা পড়িত না। আসল সাহেবিয়ানার লক্ষণ কি, তাহা তাঁহার জুরিস্‌ডিক্সনের জমীদার হইতে পেয়াদা পর্য্যন্ত কেহই জানিত না, এবং তিনি যে সকল সাহেবের সহিত আত্মীয়তাস্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, তাহারাও আবশ্যক হইলে অনায়াসে পৃষ্ঠে জয়ঢাক তুলিয়া লইতে পারিত।

তিনি বাড়ীতে, সার্কিট-হাউসে বা তাম্বুর মধ্যে যে পরিমাণ সাহেবিয়ানা করিতেন, তাহার সহিত সাধারণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহার সে সাহেবিয়ানায় খানসামা ও আরদালীর দলই সময়ে সময়ে বিপন্ন হইত। কিন্তু তিনি আদালতে যে আঠার-আনা সাহেবিয়ানা করিতেন, তাহা দেখিলে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়-কাকের গল্পই মনে পড়িত। তিনি সাক্ষীর জবানবন্দী-গ্রহণের সময় ইংরাজীতে প্রশ্ন করিতেন; পেস্কার সেই প্রশ্নের বঙ্গানুবাদ সাক্ষীর কর্ণগোচর করিত; আবার সাক্ষী যাহা বলিত, তাহা হাকিম বাহাদুরকে ইংরাজী করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইত, নতুবা তিনি সাক্ষীর কথা বুঝিতে পারিতেন না!—বাঙ্গালী-খৃষ্টানেরা ত বঙ্গভাষায় এমন অনভিজ্ঞ হয় না; তবে তিনি বাঙ্গালাটা এমন করিয়া ভুলিবার সুবিধা কোথায় পাইলেন? ইহার উত্তরে স্থানীয় ফৌজদারী-আদালতের মোক্তার জয়হরি ভৌমিক বলিতেন, ডেপুটী সাহেব বাল্যকালে গাধার দুধ খাইয়া মানুষ হইয়াছিলেন, মাতৃস্তন্যের আস্বাদন কখনও তিনি পান নাই। যাহা হউক,

সাহেবিয়ানার উপসর্গগুলি কখনও হামিক বাহাদুরের ধৈর্য্য নষ্ট করিয়াছে,—এরূপ শুনি নাই।

নিজের অন্তঃপুরেও তিনি সমাজসংস্কারের দীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারই প্রখরালোকে ডেপুটী-গৃহিণী শাড়ী ও মল ফেলিয়া গাউন ও জুতা ধারণ করিয়াছিলেন! কিন্তু বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চি চিরকালই দৃঢ় হইয়া থাকে। ডেপুটী-বাবুর এক-মাত্র আদরিণী দুহিতা সুমতী ওরফে সোফী, বিবিয়ানায় পিতা-মাতাকেও পরাস্ত করিয়াছিল। সহিস, কোচম্যান, আর্দ্দালী, বেহারা সকলের কাছেই সে "মিস্ বাবা।" টেবিলে না বসিলে সোফীর আহার হইত না, কাঁটাচাম্‌চে ভিন্ন মুখের গ্রাস মুখে উঠিত না; রেলের গাড়ীর গাড়োয়ান ও নীল-কুঠীর প্রহরী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর সাহেব-ললনাদিগের আদর্শে সোফী এমন বিবি বনিয়া গিয়াছিল যে, সে মনে করিত সাবান ঘসিয়া পোড়া রংটাকে যদি কোনও রকমে বদলাইতে পারে, তাহা হইলে সে কোনও ইংরাজী-উপন্যাসের নায়িকার মত প্রেমের অভিনয়ে কত নীল-কুঠীর সাহেবদের টুপিসমেত মাথাগুলা ঘুরাইয়া দিতে পারিবে।

২

বাঙ্গালীর মেয়ে হাজার মেম সাজুক, আর শুইয়া-বসিয়া নবেল পড়িয়া দিন কাটাক্, যৌবন তাহার দেহে আধিপত্যের চিহ্ন বিস্তৃত করিয়া বিস্মৃত হয় না। মিস্ সোফী যখন সতর বৎসরে পদার্পণ করিল, তখন একদিন শান্যাল-গৃহিণীর হৃদয়ে বাঙ্গালীসুলভ

চাঞ্চল্যের উদয় হইল। তিনি কিঞ্চিৎ অনুযোগের স্বরে ঝঙ্কার দিয়া ডেপুটী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ্‌তে দেখতে মেয়েটী কলাগাছের মত বেড়ে উঠছে, ওর বিবাহের কি করছো?" স্যাণ্ডেল সাহেব সে সময় একটি গরু-চুরীর মামলার রায়ে নিজের বিদ্যাপ্রকাশের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন; তথাপি গৃহিণীর ঝঙ্কারে তাঁহাকে গরুচোর অপেক্ষাও অধিক নিষ্প্রভ হইয়া উঠিতে হইল।

তাহার পরই সোফীর বিবাহের জন্য বরের সন্ধান আরম্ভ হইল। ডেপুটী-বাবু অনেক চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বি, এল্, ও পাঁচটি এম্, এ, বর সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু সোফী একে-একে সকলকেই নামঞ্জুর করিল। সে তাহার মায়ের সঙ্গে তর্ক করিতে বসিল,—একটি বি, এল তিন বৎসর আদালতে গর্দ্দভের বোঝা বহিয়া, বিশেষ সুকৃতি থাকিলে মুন্সেফী লাভ করিতে পারে; একটি এম্, এ'র মূল্য এক শত টাকা, (এখন অনেক কম), এ অবস্থায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীমাত্র-সম্বল কোনও 'ইয়ংম্যান'কে তাহার জীবনের 'পার্টনার' করিতে পারে না। ইহাতে তাহার 'লাইফ্‌টাই' 'ব্লাষ্টেড্' হইয়া যাইবে।—যথাকালে এ কথা ডেপুটী-সাহেবের কর্ণগোচর হইল।

তখন অগত্যা ব্যারিষ্টারের দিকে স্যাণ্ডেল সাহেবকে দৃষ্টিপাত করিতে হইল। কলিকাতার হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরী নামক মানস-সরোবরের সহিত তাঁহার ন্যায় মফস্বলবাসী ক্ষুদ্র রাজহংসের কোনও পরিচয় ছিল না। তিনি সে টক্ আঙ্গুরের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আদালতে মামলা করিবার জন্য কোনও

কোনও ধনবান মক্কেল দুই একজন জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের আমদানি করিতেন। সেই জুনিয়ার যদি 'ব্যাচিলার' হইতেন, তাহা হইলে স্যাণ্ডেল সাহেব তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ত্রী-কন্যার সহিত তাঁহার পরিচয় না করাইয়া ছাড়িতেন না। বাবুর্চিদের কাজ অনেক বাড়িয়া যাইত, এবং মুসলমান-পল্লীতে মুরগী ও আণ্ডা দুর্লভ হইয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহারা ডেপুটী-সাহেবের সোফীর সহিত শিষ্টাচার-সুলভ করমর্দ্দন করিয়াই আতিথ্যের সম্মানরক্ষা করিতেন!

অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া মিঃ স্যাণ্ডেল এক বৎসরের ফার্লো গ্রহণ করিয়া কিছুদিনের জন্য কলিকাতার বাসেন্দা হইয়া বসিলেন। বিলাতফেরত যুবকদের সঙ্গে যে সকল ক্লাবের অধিক ঘনিষ্টতা, সেই সকল ক্লাবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন; বিলাত-ফেরতদের সঙ্গে বন্ধুতাস্থাপন করিয়া অনেককে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেও ত্রুটী করিলেন না। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার এক মাসের বেতন দশদিনে খরচ হইতে লাগিল। কিন্তু বৃথা ব্যয়! বিলাতফেরত সিবিলিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার বা ডাক্তার দূরের কথা, প্রোফেসারের মত নিরীহ প্রাণীরাও মিস্ সোফীর আইবুড়ো নাম ঘুচাইতে অগ্রসর হইলেন না। দুই একটি ব্রিফ্-শূন্য ব্যারিষ্টার ও রোগীশূন্য ডাক্তারকে তিনি একটু প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহারা চক্ষুলজ্জায় 'হাঁ' 'না' কোনও জবাবই দেন নাই; শেষে বাধ্য হইয়া বন্ধুমুখে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার মেয়েটী বর্ণে ও সামাজিক শিষ্টাচারে ভদ্রসমাজে অচল! হতাশ হইয়া মিঃ স্যাণ্ডেলের ক্রোধ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

এক বৎসরের ফার্লো শীতকালের বেলার মত দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল।

অবশেষে ডেপুটী সাহেবের মাথায় একটি ফন্দী গজাইল! তিনি বুঝিলেন, তৈয়ারী ব্যারিষ্টার পাওয়া কঠিন, অতএব ব্যারিষ্টার তৈয়ারী করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। তিনি 'ষ্টেট্সম্যান' ও 'ডেলি-নিউসে' বিজ্ঞাপন দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উচ্চশিক্ষিত যুবক তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহাকে তিনি ব্যারিষ্টারী শিখিবার জন্য নিজব্যয়ে বিলাতে পাঠাইবেন। বিজ্ঞাপনটিতে তিনি নিজের নাম প্রকাশ করিলেন না, A. B. C. Co Manager এই ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে, বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত হইল।

এইবার ডেপুটী সাহেব আশানুরূপ ফল লাভ করিলেন। বেকার গ্রাজুয়েটগণ দলেদলে দরখাস্ত পাঠাইতে লাগিল। সোফী স্বয়ং স্বামিনির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করিল। অনেকেই উমেদার-বেশে ডেপুটী সাহেবের গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিল। অবশেষে শ্রীমান্ অখিলভূষণ বাগচী এম্, এ'র ভাগ্য প্রসন্ন হইল; অনেক দেখিয়া শুনিয়া সোফী তাঁহাকেই স্বামিত্বে বরণ করিতে সম্মত হইল।

বিবাহটা হিন্দুমতে হইল, কি ব্রাহ্মমতে হইল, বলিতে পারি না। অখিলভূষণের সঙ্গে মিস্ সোফী অর্থাৎ কুমারী সুমতির বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ হইল বটে, কিন্তু মিলন হইল না। মিসেস্ বাগচী

তাঁহার এম্, এ, স্বামীকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন, সামাজিক-হিসাবে তিনি মিসেস বাগ্‌চী নাম গ্রহণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাঁহার স্বামী ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের দাম্পত্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে না। মিঃ বাগ্‌চী এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ না করিয়া এক পক্ষে মধ্যেই ইংলণ্ডযাত্রা করিলেন। বিবাহটা কলিকাতাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

৩

এমন গোরার মত মেজাজের ধর্ম্মপত্নীলাভ ভাগ্যে আছে, শ্রীমান অখিলভূষণ তাহা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই, পারিলে হয় ত এ বিবাহে তিনি সম্মত হইতেন না। তিনি দেখিয়াছিলেন, মেয়েটি একটু কালো, কিন্তু দশ হাজার টাকা মূল্যের এমন কালো মেয়ে যে শেষে তাঁহার সঙ্গে দাম্পত্য-সম্বন্ধ পর্য্যন্তই অস্বীকার করিয়া বসিবে, ইহা কে জানিত ? অখিলভূষণের নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, ঢাকা জেলায় ; সুতরাং তিনি এ অপমান সহজে ভুলিতে পারিলেন না ; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কথা কাহাকেও জানিতে দিলেন না।

জাহাজে পা দিয়াই অখিলভূষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি এ অপমানের প্রতিশোধ দিবেন। কিরূপে যে প্রতিশোধ দিতে হইবে, তাহা পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার মন একটু প্রসন্ন হইল।

বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য খরচের অভাব হইল না ; ডেপুটী সাহেব নিয়মিতরূপে মাসে মাসে তাঁহাকে আড়াই শত

টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। অখিলভূষণ আন্তরিক যত্নের সহিত আইনশাস্ত্রের অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিলেন।

সামাজিক শিষ্টাচারের অনুরোধে অখিলভূষণ ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া স্ত্রীকে দুইএকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে সোফী তাঁহাকে জানাইয়াছিল, তাহার পিতা তাঁহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ-ব্যয় করিয়া তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন; এখন তাঁহার মনো-যোগ দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার পূর্ব্বে সে তাঁহার নিকট হইতে প্রেমপত্র পাইবার জন্য উৎসুক নহে। অখিলভূষণ যথাসময়ে সেই পত্র পাইলেন। তিনি পত্রখানি সযত্নে ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিলেন; সে পত্রের উত্তর লিখিলেন না। সোফীও তাঁহাকে আর পত্র লিখিল না। ডেপুটী সাহেব মাসান্তে একখানি পত্রে সংক্ষেপে তাঁহার পারিবারিক কুশলবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেন।

দুই বৎসর পরে মিঃ বাগ্‌চী বিশেষ প্রশংসার সহিত ব্যারিষ্টারীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ভারতীয় সংবাদপত্রে পরীক্ষাফল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি শ্বশুরকে তার করিয়া সে সংবাদ জানাইলেন; এবং দেশে ফিরিবার খরচ চাহিয়া পাঠাইলেন। মিঃ স্যাণ্ডেল সেইদিনই টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডারে তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

পরের মেলে সোফীর এক পত্র বাগ্‌চী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। তখন তিনি ইংলণ্ড হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিতেছেন। অখিলভূষণ হস্তাক্ষর দেখিয়াই বুঝিলেন, সোফীর পত্র। পত্রখানি তিনি দুই চারিবার উল্টাইয়া দেখিলেন,

তাহার পর খামের উপর লাল কালি দিয়া মোটা হরফে লিখিলেন, "Refused.—A. Buckchie." কলিকাতার ডেড্-লেটার আফিসের চৌকা মোহর ঘাড়ে লইয়া পত্রখানি যখন সোফীর নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন সে একবার কল্পনাও করিতে পারিল না, তাহার সুদীর্ঘ প্রেমপত্রের এমন শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে। যাহা হউক, ডেড্ লেটার আফিসের বাদামী রঙ্গের লেফাফাখানি ছিঁড়িতেই সোফীর বাঁকা বাঁকা অক্ষরে ভূষিত অখিলভূষণের শিরোনামাঙ্কিত পত্রখানি বাহির হইয়া পড়িল। সোফী মনে করিল, এ পত্র বিলাতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অখিলভূষণ স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন, তাই পত্র তাঁহার হস্তগত হয় নাই। কিন্তু সে ভ্রম অধিককাল স্থায়ী হইল না ; পত্রের উপরে লাল কালিতে মোটা মোটা অক্ষরে "Refused" ও তাহার নীচে 'A. Buckchie.' নাম স্বাক্ষর দেখিয়াই সোফীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। অখিলভূষণের নামের সেই সাহেবী-মার্কাধারী সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি যেন একসারি দাঁত বাহির করিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

সোফী পত্রখানি হাতে লইয়া স্খলিতপদে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পদতলে পৃথিবী ঘুরিতেছিল ; চক্ষুর সম্মুখে জগতের আলো নিবিয়া গিয়াছিল। সোফী পত্রখানি বিছানার উপর ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে বাতায়নপথে চাহিয়া থাকিল।

সোফীর পিতা তখন সবডিবিজানের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী হাকিম। নদীতীরে বাঁধের উপরেই সবডিবিজান-অফিসারের বাঙ্গালা। সে দিন সারদীয় সপ্তমীর প্রভাত ; পীত রৌদ্র নদীজলে

পড়িয়া তরঙ্গের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে; নদীতীরস্থ পথ দিয়া কত পুরুষ ও রমণী গল্প করিতে করিতে হাটে যাইতেছে; প্রবাসী বিদেশ হইতে আশাপূর্ণহৃদয়ে নৌকাযোগে গৃহে ফিরিতেছেন; পেলব-কুসুমদলে সমাচ্ছন্ন একটা শিরীষগাছের ডালে বসিয়া কতকগুলি পাখী বিচিত্র কলধ্বনি করিতেছে; আর দূরে পূজা-বাড়ীতে ঢাকের শব্দে একএকবার উৎসবের বার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু কোনও দিকে সোফীর দৃষ্টি নাই; কোনও শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যে সকল চিত্তবিমোহিনী আশার কুসুমে সে তাহার বিশ বৎসরের অপরিতৃপ্ত যৌবনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনাগত-সুখের মুখ চাহিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়াছিল, অদৃষ্টদেবতার এক নিশ্বাসে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে।

৪

দুই তিন মাসের মধ্যে ব্যারিষ্টার অখিলভূষণের কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। ডেপুটী সাহেব বড় চিন্তিত হইলেন। লণ্ডন-প্রবাসী দুই তিন জন আইনপরীক্ষার্থী বাঙ্গালী-যুবকের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, অখিলভূষণের সংবাদ পাঠাইবার জন্য তাহাদিগকে টেলিগ্রাফ করিলেন। যথাসময়ে উত্তর আসিল, অখিলভূষণ দুই মাস হইল লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছেন; হয় ত তিনি কণ্টিনেণ্ট ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতেছেন। কণ্টিনেণ্ট-ভ্রমণে তাঁহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের অপব্যবহারের সম্ভাবনায় মিঃ হ্যাণ্ডেল বড়ই ক্ষুণ্ণ ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে তিনি একদিন ইণ্ডিয়ান ডেলি-নিউসের একটি স্তম্ভে পাঠ করিলেন, তিন দিন পূর্ব্বে অখিলভূষণ বাগ্‌চী নামক একটি যুবক মার্শেলিস হইতে ‘মিসিল’ জাহাজে চড়িয়া বোম্বে নগরে অবতরণ করিয়াছেন। এই সংবাদপাঠে ডেপুটী সাহেব অনেক-পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কৃতবিদ্য জামাতার অভ্যর্থনা করিবার জন্য বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে স্ত্রী কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন।

কিন্তু কলিকাতারূপ সমুদ্র হইতে অখিলভূষণ নামক রত্নটি খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। অখিলের একটি আত্মীয় চাঁপা-তলার একটা মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িতেন। ডেপুটী সাহেব হ্যাটকোটে সজ্জিত হইয়া সেই মেসে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শুনিতে পাইলেন, পূর্ব্বদিন প্রভাতে বোম্বে মেলে অখিলভূষণ কলিকাতায় পঁহুছিয়াছিলেন, এবং সেই মেসেই আহারাদি শেষ করিয়া সেই রাত্রেই গোয়ালন্দ মেলে ঢাকায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দাদা বিনয়ভূষণ বাবু ঢাকার কালেক্টরের অধীনে কেরাণী-গিরি করিতেন।

ডেপুটী-শ্বশুরের কর্ম্মস্থানে না গিয়া অখিলভূষণ ঢাকায় তাহার সহোদরের সঙ্গে আগে দেখা করিতে চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া ডেপুটী সাহেবের সর্ব্বাঙ্গে যেন কে সবলে বেত্রাঘাত করিল। জামাতার অকৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নিবিড়শ্মশ্রু-শোভিত কৃষ্ণবর্ণ মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। এক মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ভ্রমে পড়িয়া গত তিন বৎসরে সাড়ে দশ হাজার

টাকা জলে ফেলিয়াছেন। কতদিনের উপার্জ্জনে তিনি সে টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, এবং টাকাগুলি এ ভাবে অপব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা কোম্পানীর কাগজ কিনিলে বাৎসরিক কি পরিমাণ সুদ তাঁহার পকেটে আসিত, তাহা সহসা তাঁহার মানস-নেত্রে সমুদিত হওয়ায়, তিনি দুর্ভাগিনী কন্যার কষ্টের কথাও বিস্মৃত হইলেন।

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ে মর্ম্মাহত হইয়া নববর্ষদিবসে ডেপুটী-সাহেব কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। পত্নী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই কোথা ?" তখন তাঁহার সুবিপুল ডেপুটী-গর্ব্ব একেবারে ধূলায় লুণ্ঠিত লইয়া পড়িল। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জামাই বোম্বাই হইতে আজও কলিকাতায় পৌঁছেন নাই।" সোণ্ণীর মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

৫

ঢাকা-বিভাগে ডেপুটী সাহেব অনেকদিন হাকিমী করিয়াছিলেন। ঢাকার কালেক্টরীতে অনেকের সঙ্গেই তাঁহার জানাশুনা ছিল। একটী বন্ধুকে অখিলভূষণের গতিবিধির বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি একখানি পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের উত্তরে তিনি যে সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কে পিনাল-কোডের সকল ধারা একত্র জমাট বাঁধিয়া গেল। তিনি জানিতে পারিলেন, অখিলভূষণ বাগ্‌চী তাঁহার দাদার গৃহে ফিরিয়া হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তিনি চটিজুতা পরেন, এবং সর্ব্বদা অঙ্গে হ্যাটকোট চড়াইয়া থাকেন না। বিলাতফেরতের এমন

শোচনীয় অধঃপতনবার্ত্তা পূর্ব্বে কখনও তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই, সুতরাং অখিলভূষণের প্রকৃতিস্থতায় তিনি অত্যন্ত সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি যখন শুনিলেন, অখিলভূষণ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে সম্মত আছেন, এবং তাঁহার দাদা সুন্দরী কন্যার সন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন তিনি প্রায়শ্চিত্তপ্রথার ও চটিজুতার উপর হাড়ে চটিলেন; কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথ দেখিতে পাইলেন না।

সেইদিন ডেপুটী সাহেব অখিলভূষণের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। বাঙ্গালা ভাষায় পত্রখানি লিখিত হইলেও ডেপুটী সাহেব তাহা পড়িবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি পাঠ করিলেন,—

"শ্রীচরণেষু,

"সবিনয় নিবেদন,—

"শাস্ত্রানুসারে আপনি আমাকে কন্যাসম্প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং সামাজিক হিসাবে আপনি আমার শ্বশুর, আমার পূজনীয় ব্যক্তি; সেই জন্য আপনাকে দেশীয় প্রথা অনুসারে শ্রীচরণেষু পাঠ লিখিয়া যদি পাশ্চাত্য-সভ্যতাসুলভ শিষ্টাচারের ব্যতিক্রম করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি আমার সে ক্রটী ক্ষমা করিবেন। আপনার অনুগ্রহেই আপনার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের সাহায্যে আমি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছি, এজন্য আমি আপনার নিকট চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

"কিন্তু আমার ব্যবহার আপনার নিকট কিছু অকৃতজ্ঞের ন্যায় বোধ হইয়া থাকিবে; সেইজন্য আমার একটা কৈফিয়ত দেওয়া উচিত; আমার কথাগুলি শুনিলে আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।

"আপনি যখন আপনার কন্যার বিবাহের বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত করেন, সে সময় যদি আপনি বিজ্ঞাপনে এ কথাও লিখিতেন যে, আপনার নির্দ্ধারিত জামাতা ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আপনার কন্যার সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না, তাহা হইলে আপনার বিজ্ঞাপিত প্রলোভন সত্ত্বেও বোধ করি কোনও ভদ্রসন্তানই আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে অগ্রসর হইত না। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে আমি সে কথা জানিতে না পারিলেও, বিবাহের পর সেই রাত্রেই তাহা জানিতে পারিয়াছি;— আপনার সুশিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না তেজস্বিনী কন্যা আমাকে স্পষ্টাক্ষরে এ কথা জানাইয়াছিলেন। তখন ফিরিবার পথ ছিল না।

"ফিরিবার পথ থাকিলে হয় ত ফিরিতাম। দাদার অনুমতি না লইয়া, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণের অজ্ঞাতসারে গোপনে আপনার কন্যাকে যে বিবাহ করিয়াছিলাম, সে কেবল বিলাতে যাইবার প্রলোভনে। দরিদ্রের সন্তান আমি, আমার সে আশা পূর্ণ হইবার আর কোনও উপায়ই ছিল না। উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়েই টাকা লইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছিলাম; তাহাই যথেষ্ট আত্মাবমাননা, তাহার উপর আপনার কন্যা-কৃত এই অপমান;—সকল দিক চাহিয়া আমি নীরবে এ অপমান সহ্য করিয়াছি।

"এ অপমান সহ্য করিয়াছিলাম বলিয়াই ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া আপনার কন্যাকে দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। যাহাকে আমি শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিয়াছি, তাহার বুদ্ধির কোনও ত্রুটী থাকিলে উদারভাবে তাহা মার্জ্জনা করিয়া ভবিষ্যৎজীবনের সুখের পথ একটু প্রশস্ত করিবার আগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। স্নেহ ও প্রেমে, কোমলতায় ও সহানুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ করিবার চেষ্টা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া আমার মনে হয় নাই; কিন্তু আপনার কন্যা আমার পত্র পাইয়া আমাকে যাহা লিখিয়াছিলেন, আজ প্রায় তিন বৎসর তাহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। সে পত্র আজ আপনার নিকট পাঠাইলাম। আপনার কন্যার শিক্ষা ও শিষ্টাচারের এই নিদর্শনটি নানা কারণে আপনার নিকট পাঠাইতে সঙ্কুচিত হইলাম না। আমার বয়স হইয়াছে, লেখাপড়াও কিছু শিখিয়াছি; কিন্তু আমার প্রধান অপরাধ, আমি দরিদ্র। আমার এই দরিদ্রতার প্রতি ভাগ্যবানের দুহিতার এইরূপ মর্ম্মান্তিক উপহাস আমি নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করিব, এতখানি উদারতা আমার নাই।

"আপনি আমার বিলাত-প্রবাসের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যে কয়েক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, আমি তাহার কড়া-ক্রান্তি হিসাব রাখিয়াছি। আমি যত শীঘ্র পারি, এই টাকা বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হারে সুদসমেত পরিশোধ করিব। এই সঙ্গে যথা-রীতি হ্যাণ্ডনোট পাঠাইলাম। আপনার ঋণপরিশোধের জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

"শাস্ত্রানুসারে আপনার কন্যা আমার পরিত্যাজ্যা নহেন ; আমি তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দায়ী। যদি তিনি আমার গৃহে আসিয়া হিন্দুমহিলার মত থাকিতে সম্মত হ'ন, হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক নীতির লঙ্ঘন না করেন, তাহা হইলে আমি প্রসন্নমনে আমাদের দরিদ্রকুটীরের এক অংশে তাঁহাকে স্থানদান করিতে সম্মত আছি। আর যদি তিনি দরিদ্রের ক্ষুদ্রকুটীরে বাস করিতে অসম্মত হ'ন, বা তাঁহার শিক্ষা ও শিষ্টাচারসুলভ রুচি পরিত্যাগে অসম্মত হন,তাহা হইলে আমি আমার অবস্থানুসারে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ভার বহন করিব। আমি দরিদ্রের সন্তান—যাহাকে লইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে পারি, যে আমাকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিবে না, এরূপ কোনও গৃহস্থকন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইব। দাদাও তাহারই আয়োজন করিতেছেন।

"আমি শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি ; বিলাতী পোষাক ত্যাগ করিয়া দেশী ধুতি-চাদর পরিতেছি ; বিজাতীয় নামের নকলকরা নাম পরিত্যাগ করিয়া পিতামাতার প্রদত্ত শ্রীঅখিলভূষণ বাগ্‌চী নাম গ্রহণ করিয়াছি। আপনার গাউন-পরিহিতা কন্যা সম্ভবতঃ এ সকল সহ্য করিতে পারিবেন না। গরীব গৃহস্থের বধূর মত লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিয়া পরিজন-বর্গের সেবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত থাকিলে, আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিতে আমার আপত্তি নাই,—এ কথা আপনি তাঁহাকে বলিতে পারেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি। প্রণত

শ্রীঅখিলভূষণ বাগ্‌চী।"

পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া ডেপুটী সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত করতলে মস্তকস্থাপন করিয়া কি ভাবিলেন; তাহার পর পোষাক বদলাইয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। একটু অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া আবার ফিরিলেন, এবং আরদালীর হস্তে পত্র দুইখানি দিয়া তাহা সোফীকে প্রদান করিতে বলিলেন।

স্থানীয় পোষ্টআফিসে উপস্থিত হইয়া তিনি ঢাকায় টেলিগ্রাফ্ করিলেন,—যেন তাঁহার জামাতা একসপ্তাহ্কাল বিবাহ বন্ধ রাখেন।

দুই তিন ঘণ্টা নদীতীরে পরিভ্রমণ করিয়া মস্তিষ্ক একটু শীতল হইলে ডেপুটী সাহেব বাঙ্গলোয় ফিরিলেন। ধীরে ধীরে সোফীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘরে একটা হারিকেন-লণ্ঠন মিট্ মিট্ করিতেছে—সোফী বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে; তাহার মাতা বিষণ্ণভাবে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছেন।

কোনও কথা না বলিয়া ডেপুটী সাহেব একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া সোফীর শিয়রে বসিলেন, এবং এবং ধীরে ধীরে সোফীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সোফী সেই স্নেহকরস্পর্শে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ডেপুটী সাহেব করুণার্দ্রস্বরে বলিলেন, "কাঁদিস্ কেন মা? তোর ত কোনও দোষ নাই। যদি কেহ অপরাধী হইয়া থাকে, ত সে আমি। তুই এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিস্?" সোফী প্রথমে কোনও উত্তর দিল না। ডেপুটী সাহেব পুনর্ব্বার

অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সোফী মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে ঢাকাতেই যাইতে হইবে।"

ডেপুটি বলিলেন, "তোমাকে মেমসাহেব করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তোমার জন্মকাল হইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালী গৃহস্থকন্যার—গৃহস্থবধূর শিক্ষা তোমাকে দিই নাই। অখিল যেমন চায়, সে ভাবে চলিতে পারিবে ?"

সোফী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

পরদিন প্রভাতে অখিলভূষণের নিকট টেলিগ্রাম গেল,— "আমরা যাইতেছি ; তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।"

সুতরাং অখিলভূষণের আর বিবাহ করা হইল না। যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে শ্রীমতী সুমতি দেবী শাঁখা ও শাড়ী পরিয়া, সিঁথায় সিঁদূর দিয়া অবগুণ্ঠনবতী হিন্দুবধূর ন্যায় পাকস্পর্শের ভোজে কুটুম্বগণের পাতে অন্নব্যঞ্জন দিল।

মিঃ হোরাস স্যাণ্ডেল অতঃপর হ্যাটকোট ছাড়িয়া চোগা চাপকান ধরিয়াছেন। শুনিয়াছি, তিনি আর অখাদ্য খান না, এবং মাথায় একটি খাটো টিকি রাখিয়াছেন !

কিন্তু সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মিঃ হোরাস স্যাণ্ডেল পঞ্চদশ বৎসরের সার্ভিসের পর গবর্মেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—সার্ভিস-লিষ্টে তাঁহার পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন নাম বসান হউক—"বাবু হরিশ্চন্দ্র সান্যাল।"

ভ্রমণী।

—:০:—

১

হিমালয়বক্ষে বিরাজিত একটি উপত্যকায় একটি সুন্দর সহর কিরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু সে সহরে যে আসে, সেই প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। কয়েকজন পেন্সনপ্রাপ্ত সাহেব এই স্থানটিতে বাস্তুভিটা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই কারণে সহরটিতে বিস্তর শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও মহিলার সমাগম হইত। সিমলায় যখন মরসুম পড়ে, এখানকার জনকোলাহল তখনই বাড়িয়া উঠে। বিশেষতঃ, যে বৎসর বায়ু-সেবনের হুজুক বৃদ্ধি হইত, সে বৎসর বাঙ্গালীটোলাটি একেবারে গুল্‌জার হইত। বাঙ্গালা দেশের অনেক বড়লোকই সেই উপলক্ষে এখানে পদার্পণ করিতেন। আমি বড়লোক নহি, বায়ুভক্ষণেরও আমার কোন আবশ্যক ছিল না, তবু আমি এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি। সখ করিয়া নহে; প্রায় কোন স্থানেই দুই মাসের বেশী থাকিতে প্রবৃত্তি হয় না; এখানে আমি ছয় মাস আছি।—মন টিকিয়াছে কি না, সে কথা কোনদিনও চিন্তা করি নাই।

একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা আমার বাসগৃহ। দূর অরণ্য হইতে বায়ুর হিল্লোল আসিয়া পুরাতন সুখের স্মৃতি মনের মধ্যে জাগাইয়া যায়; মধ্যে মধ্যে আরণ্য-কুসুমের সৌরভে আমার বাঙ্গালাখানি আচ্ছন্ন হয়, এবং বাতায়নপথে গিরিশৃঙ্গের সহিত ধূম্রকান্তি মেঘের আলিঙ্গন দেখিতে দেখিতে যেন কোনও দূর স্বপ্নরাজ্যে ভাসিয়া যাই। আমার অতৃপ্ত-কামনা পাহাড়ের বাহিরে বহিঃপৃথিবীর মধ্যে ব্যাপ্ত হইবার সুবিধা না পাইয়া যেন সেই সংকীর্ণ স্থানটিতে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত; কিন্তু আমার কি হইয়াছে, আমি ঠিক বুঝিতে পারি না।

বাঙ্গালায় আরও দুইটি প্রাণীর সহিত আমি একত্র বাস করি; একজন সেই দেশীয় একটি ভৃত্য, নাম লখিয়া। সে বহুরূপী; কখন ভৃত্য, কখন পাচক, কখন দরোয়ান; আরদালীগিরিও যে তাহাকে দুই একবার করিতে হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। লুচি ভাজিতে ও জুতা ব্রস করিতে সে সমান তৎপর। আমার অন্য সহচরটির নাম রামচরণ, সে আমার পিতামহের আমলের ভৃত্য।

রামচরণের বাল্য-জীবনের ইতিহাসটি করুণরসসিক্ত। সে আমার পিতার বয়সী। সে যখন আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল, শুনিয়াছি তখন তাহার বয়স তের বৎসর। এখন তাহার পেন্সন লইবার বয়স হইয়াছে, পঞ্চান্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সে শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাদের পরিচর্য্যা করিবে, এরূপ সঙ্কল্পই স্থির করিয়াছে। পিতামহ আশ্রিতবৎসল ছিলেন, তিনি রামচরণকে একটি

বাড়ী দিয়াছিলেন, রামচরণের বিবাহও তিনি দিয়া যান। কিন্তু হতভাগ্যের গার্হস্থ্যসুখ স্থায়ী হইল না। রামচরণের হস্তে তাহার পত্নী মুক্তকেশী একটী পুত্রসন্তান উপহার দিয়া বিধাতার আহ্বানে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মাতৃহীন শিশুকেও বাঁচাইতে পারা গেল না। রামচরণ অশ্রু মুছিয়া আমার পিতামহের কাছে আসিয়া বলিল, "জেঠামহাশয়! সংসারধর্ম্ম সব শেষ করে' এসেছি; এই ঘরের চাবি নেন, আমার আর বাড়ীঘরের দরকার নেই, বৈঠকখানার এক কোণেই পড়ে থাক্‌বো।" পিতামহ কথাটা বুঝিলেন, দাসদাসীর বেদনাবোধের শক্তি নষ্ট করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। তিনি বলিলেন, "কি বলবো বাবা! তোকে সংসারী কর্‌বার জন্য আমরা যথাসাধ্য করেছি।" শোক কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে, তাহার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দিয়াছিল, আর একটি দারপরিগ্রহ করিলে তাহার সংসারধর্ম্ম পুনর্ব্বার বজায় হইতে পারে। রামচরণ সে কথার কোনও উত্তর দিত না, সে আমার ভগিনী সুরবালাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিত, "এদের নিয়েই আমার সংসার।"

আমি সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইলে রামচরণই আমাকে কোলে তুলিয়া লয়; সংসারে আসিয়া মাতৃক্রোড় হইতে সর্ব্বপ্রথম তাহার ক্রোড়েই আশ্রয় লাভ করি। মা আমার স্বর্গে গিয়াছেন। এখনও কত সময় রামচরণের স্নেহের কোলে মাথা রাখিয়া দগ্ধ-জীবন শান্ত করি। রামচরণের নিকট আমি এখনও খোকা-বাবু।

আমার স্নেহময়ী ভগিনী সুরবালাকেও রামচরণ কম ভাল-বাসিত না, কিন্তু সুরবালার জন্য রামচরণের কোন আক্ষেপ নাই। সুরবালাকে রামচরণ 'ননি' বলিয়া ডাকিত। ননির জন্য সময়ে সময়ে তাহার মন কেমন করিত ; কিন্তু ননি সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত ; আমার ভগিনীপতি ভবেশ বাবু একজন বড় ডেপুটী। দুই হস্তে উড়াইবার মত পৈত্রিক-সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন চাকুরী করেন, সে রহস্য আমি কখনও ভেদ করিবার চেষ্টা করি নাই। বোধ করি, রায়বাহাদুর খেতাবই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য নহে। যাহা হউক, সুরবালা যোগ্যপাত্রেই পড়িয়াছে। সুরবালা সংসারের কর্ত্রী, আমার ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট ভগিনীপতি তাহাকে তাঁহার উপরওয়ালা ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা অধিক ভয় করিতেন।

আমি যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন বৈশাখ মাস। অপরাহ্ণে হঠাৎ মেঘ করিয়া বৃষ্টি আসিল ; বাঙ্গালার সার্সীগুলা বন্ধ করিয়া আমি একখান নেয়ারের খাটে শুইয়া শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলাম, তাহা তখন কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও বলিতে পারিতাম না।

রামচরণ আমার মাথার কাছে বসিয়া, দেশে আমাদের বাগানে এবার কি পরিমাণে আম ফলিয়াছে, তাহারই আলোচনা লইয়া ব্যস্ত ছিল। সে কথা দুই একবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল,—শেষে রামচরণ উঠিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিল, একটা জলের ঝাপ্‌টা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রামচরণ জানালা বন্ধ করিয়া আমার পায়ের কাছে আসিয়া

বসিল ; বলিল, "খোকাবাবু! তোমার পায়ে একটু হাত বুলোই ?" আমার চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বোধ করি পূর্ব্বকথা রামচরণের মনে পড়িয়া গেল ; সে বলিল, "খোকাবাবু! অন্নের জন্যে এমন সাজান সংসারটা নষ্ট কল্লে! এ আপশোষ মলেও ত আমার যাবে না।"

রামচরণ আমার সংসারত্যাগের কারণ জানিত। পৃথিবীতে আমরা তিনজন মাত্র লোক ইহা জানিতাম ; রামচরণ, আমি, আর—আর এক জন। সে কে, তাহা একটু ভাঙ্গিয়া বলিলে কথাটা বুঝিতে পারা যাইবে।

২

সে অনেক পূর্ব্বকার কথা—প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বের। আমার বয়স এখন সাতাশ বৎসর। এখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, নামক চক্রচিহ্নিত শিক্ষিত যুবক; কিন্তু যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি এই তুচ্ছ জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা ঠিক দশ বৎসর পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বের সহিত আজিকার দিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। সতের বৎসর বয়সের যে উৎসাহ, উদ্যম, যে প্রফুল্লত', যে হৃদয়ভরা স্ফূর্ত্তি,—তাহার তুলনা দুর্ল্লভ। বর্ষাজলপুষ্ট লতার শ্যামলতা, প্রভাতপদ্মের বর্ণের অরুণিমা, শরতের পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র কিরণে যূথিকার হাসি, এ সকল অনেকবার দেখিয়াছি, কখন কখন মুগ্ধও হইয়াছি ; কিন্তু নারীমুখের সৌন্দর্য্য কি, তাহা তখন ঠিক

বুঝিতে পারিতাম না ; যে সৌন্দর্য্য চিরদিন চিত্তকে মরীচিকার মত উৎক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যে মিশাইয়া যায়, তাহার মহিমা তখনও আমি অনুভব করিতে পারি নাই।

সতের বৎসর বয়সে এল্, এ, পাশ করিয়া আমি সুরবালার শ্বশুরবাড়ী যাই। সুরবালার বয়স তখন পনর বৎসর। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে সুরবালার বিবাহ হইয়াছিল। আমার ভগিনী-পতি ভবেশ বাবু তখন বি, এ, পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সিতে এম্, এ, পড়িতেন। পূজার ছুটিতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন, আমি পূজার অবকাশে সুববালাকে দেখিতে তাঁহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম।

আমি ভবেশ বাবুদের বাড়ী উপস্থিত হইলে, ভবেশ বাবু আমাকে আদর করিয়া একেবারে অন্দরমহলে লইয়া চলিলেন। তাঁহার শয়নকক্ষে তুখানি চেয়ারে আমরা মুখোমুখী হইয়া গল্প করিতেছি, এমন সময়ে একটি যুবতী—যুবতী কি কিশোরী ঠিক বলিতে পারি না—সুরবালার প্রায় সমবয়স্কা একটি সুন্দরী "দাদা বড় মজা হয়েছে!" বলিয়া উন্মুক্তহাস্যে যেন হঠাৎ কক্ষটি ঝঙ্কারিত করিয়া বিত্যুতের মত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ; হঠাৎ আমাকে দেখিয়া মুখখানি লাল করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাসি ও ব্যস্ততা মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইল। এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইয়া মুখখানি নত করিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে সে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। তাহার দাদা তাহাকে ফিরাইবার জন্য কতবার ডাকিলেন, দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহাকে ডাকিলেন ; সুন্দরী ফিরিল না। ভবেশ বাবু বলিলেন, "রমণীর বড় লজ্জা, তোমাকে দেখেও

লজ্জা।" তাঁহার হাস্যময় মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

আমি জানিতাম, রমণী কে। রমণী ভবেশ বাবুর কনিষ্ঠা সহোদরা; রমণী বিধবা, সে সংবাদও রাখিতাম। পূর্ব্বে আর কখনও ভবেশ বাবুদের বাড়ী যাই নাই। রমণীকে এই সর্ব্বপ্রথম দেখিলাম।

কিন্তু কি দেখিলাম। এমন আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। দেখিয়া বোধ হইল, ঘনকৃষ্ণ মেঘের ভিতর বিজলী খেলিয়া গেল; সেই চকিত বিদ্যুতের আলোকে আমার বোধ হইল, আমার সতের বৎসরের আলোকহীন, উজ্জ্বলতাহীন যৌবনের রুদ্ধকক্ষে কে যেন বাতি জ্বালিয়া আলোকিত করিয়া গেল।

তিন দিন পরে ভবেশ বাবুর বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। কিন্তু দেখিলাম, তিন দিনের মধ্যেই আমার মনের মধ্যে একটা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বিপ্লবের কারণও বুঝিলাম, ফলও ভোগ করিতে লাগিলাম; কিন্তু মন সংযত করিবার পক্ষে কোন যুক্তিই কাজে লাগাইতে পারিলাম না। রক্তমাংসের শরীর ভেদ করিয়া যে ছুরিকা মনের উপর দাগ বসাইয়া যায়—তাহার তীক্ষ্ণতা একটি মুহূর্ত্তেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।—রমণীকে ভুলিতে পারিলাম না।

বাড়ী ফিরিয়াও রমণীর কথাই মনে জাগিতে লাগিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল, মনকে নানা কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম—কোনও ফল হইল না। নিজের মনের

সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও অবসন্ন হইলাম। এক মাসও উত্তীর্ণ হইল না, আমি সুরবালকে দেখিতে আবার ভবেশ বাবুর বাড়ী চলিলাম। সত্যই কি সুরবালাকে দেখিতে?—সুরবালার বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে দেখিতে যাই নাই; সে কথাও মনে পড়িল। আত্মসুখের জন্য আমাকেও আত্ম-প্রবঞ্চনার দাসত্ব করিতে হইল।

সে দিন প্রথমেই বাহিরের ঘরেই ভবেশ বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তাহার পর ভবেশ বাবু অন্দরের যাইবার জন্য উঠিলেন, গল্প করিতে করিতে চলিলেন, আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। লজ্জা আসিয়া প্রতিপদে বাধা দিতে লাগিল। ভবেশ বাবু আমাকে লইয়া একেবারে তাঁহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। রমণী তখন টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একখানি বহি পড়িতেছিল। দরজার সম্মুখে আমি, ভবেশ বাবু ভিতরে—রমণী পলাইতে না পারিয়া হাঁপাইয়া উঠিল। মুখখানি অবনত করিল।

আমি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। তাহাতে এমন একটা সলজ্জ কোমলতা মাখান ছিল যে,—আমার নূতন করিয়া মনে হইল, এ অপরূপ সুন্দরী। রমণী বিধবা? বিধাতার এ কি বিচার!

সে দিন আমাদের পরিচয়মাত্র। ক্রমে অধিক আলাপে রমণীর সঙ্কোচ দূর হইল। আমার নিকট তাহার কুণ্ঠিতভাব রহিল না; আমি মধ্যে মধ্যে সুরবালাকে দেখিতে যাইতাম। আমাকে দেখিয়া রমণী কোন প্রকার হর্ষ প্রকাশ করিত না, নিজের গাম্ভীর্য্য দ্বারা

আপনাকে অবগুণ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু তাহার নয়নের ব্যাকুলতা সে লুকাইতে পারিত না; অন্যমনস্কতা ঢাকিবার জন্য তাহাকে জোর করিয়া সকল কাজে মন দিতে হইত।

পাঁচ ছয় মাস পরে কথায় কথায় রমণীর কাছে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিলাম। রমণী ধীরভাবে সকল কথা শুনিল, কোনও উত্তর না করি মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কেবল সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

শরীর অবসন্ন, মন ভারাক্রান্ত, কোনও কর্ম্মে উৎসাহ নাই। বাবা আমাকে দারজিলিং পাঠাইলেন; রামচরণ আমার শুশ্রূষার জন্য সঙ্গে চলিল। দিনকতক বাড়ীর কোনও খবর পাই নাই। শেষে এক প্রিয়বন্ধুর পত্রে অবগত হইলাম, বাবার হাতের কাজকর্ম্ম বড় মন্দা, তিনি আমার বিবাহের জন্য একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজিতে-ছেন। বন্ধুর পত্র পাঠ করিয়া একটু হাসিলাম।—রামচরণ আমার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমার হাসি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"পত্রে কোন সুখবর আছে না কি, খোকা বাবু?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বাবা যে আমার বিয়ের যোগাড় কচ্ছেন, রামচরণ! ফলারটা বুঝি এবার খেলি।"

রামচরণ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আর ফলার! তোমার যে গতিক—দেখিয়া আমার বড়ই ভাবনা হইয়াছে।"

৩

দিন কত পরে দারজিলিংএ একখানি পত্র পাইলাম। অপরিচিত অক্ষর, দেখিয়াই স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর চিনিতে পারিলাম।

আনাকে কে পত্র লিখিল? কতক কৌতুকে, কতক আগ্রহে পত্রখানি খুলিলাম। দেখিলাম, পত্রশেষে রমণীর স্বাক্ষর! রমণী আমাকে পত্র লিখিয়াছে। কখনও মনে করি নাই, রমণীর নিকট হইতে পত্র পাইব।

পত্রখানি একনিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম।

"অনাথ বাবু,

দাদাকে যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা পড়িয়াছি। তোমার শরীরের এখন যে রকম অবস্থা, তাহাতে তোমার কিছুদিন দারজিলিংএ থাকা উচিত। পড়িয়া পড়িয়াই শরীরটা নষ্ট করিয়াছ। বৌদিদি তোমার জন্য বড় ভাবিতেছেন। তুমি ভাল আছ শুনিতে পাইলেই সুখী হইব। দারজিলিংএ কত দিন থাকিবে?

"তোমার মনের অবস্থা শোচনীয়, তাহা বুঝিয়াছি। দারজিলিংএ যাইবার পূর্ব্বে আমাকে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহার কোনও উত্তর পাও নাই। অভাগিনী আমি কি উত্তর দিব? আমি বালবিধবা, বিবাহের কথা মনে নাই, স্বামীর মুখও মনে পড়ে না। সে কথা মনে না পড়াতে কোন দুঃখ ছিল না, পিতৃগৃহে আমোদ-আহ্লাদেই দিন কাটাইতেছিলাম। সেইভাবে জীবন কাটাইলেই কি ভাল ছিল না?

"কিন্তু তাহা কাটিল না। আমি তোমাকে দেখিলাম। না দেখিলেই বোধ হয় ভাল ছিল; কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। তুমি আমাকে ভালবাস, তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে। হিন্দুবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, তাহা আমি অনেকবার শুনিয়াছি।

কিন্তু ইহজীবনে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। পৃথিবীতে আমার আর সংসারী হওয়া হইবে না। সমাজের ভয়ে এ কথা লিখিতেছি না। কলঙ্কের ভয়ে মানুষ জীবনের সকল কামনা পরিত্যাগ করে না। তথাপি বলিতেছি, সংসারের এ পারে আর তোমার সহিত সে ভাবে দেখা হইবে না। পরপারের জন্য অপেক্ষা করিতে পার? যদি পার, তবে আবার দেখা দিও। তাহা কি এতই কঠিন? আমি ত তাহা মনে করি না।

রমণী"

দুইবার তিনবার পত্রখানি পাঠ করিলাম। রমণী-হৃদয়ের রহস্য কিছু বুঝিতাম না। পরাজিত হইয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলাম। বিপুল চেষ্টায় মস্তক অবনত করিয়া বলিলাম, তাহাই হউক, তাহাই হউক, ইহলোকে এই পর্য্যন্ত; পরলোকে আমার শান্তি। ইহ-লোকের এ গণ্ডীটুকু অতিক্রম করিতে আর কতদিনই বা অপেক্ষা করিতে হইবে?

যথাসময়ে রমণীকে সে কথা জানাইলাম।

৪

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই অনেক উমে-দার আমাকে তাঁহাদের কন্যারত্ন-সম্প্রদানের প্রস্তাব করিয়া বাবাকে ধরিয়াছিলেন। কেন বিবাহ করিব না, সে কৈফিয়ৎ পিতার কাছে দিলাম না। জলের মত দিন কাটিতে লাগিল—সব কয়টা দিন এক সঙ্গে কাটিলেই বাঁচিতাম।

পূর্ব্বের মত মধ্যে মধ্যে ভবেশ বাবুর বাড়ী যাই ; রমণী পূর্ব্বের ন্যায় হাসিয়া কথা কয়, গল্প করে, কিন্তু কখনও ভাবান্তর দেখি নাই। আমারও শিক্ষা হইয়াছিল—আমিও কোনদিন অন্য চিন্তা করি নাই। প্রেমের আকর্ষণ আমাকে রমণীর নিকট টানিয়া আনিত, কিন্তু মোহ সেই দেবীর সম্মুখে আমাকে বিহ্বল করিতে পারিত না। রমণী যখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন তাহাকে আমার ছায়া বলিয়া অনুভব করিতাম, কিন্তু মনের কোণেও বিন্দুমাত্র পার্থিব কামনার উদয় হইত না। রমণীর দৃষ্টান্তে আমি মন সংযত করিয়াছিলাম।

মাসছয়েক পরে বাবা সংসারের কাজ শেষ করিয়া স্বর্গে গেলেন ; মা ত অনেক পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন। বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে আমি, আর রামচরণ।

বাবার মৃত্যুর পর রামচরণ আমাকে বিবাহ করিবার জন্য আর একবার ভাল করিয়া ধরিল। আমার সেই এক উত্তর,—একটু নীরব হাসি। বেচারা বৃদ্ধ আমার কথা কি বুঝিবে ?

ভবেশ বাবুই আমার একরকম অভিভাবক হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই এম্, এ, পাশ করিয়াছিলাম। তাঁহার ইচ্ছা, আমি উকীল হই, না হয় ডেপুটীগিরি পরীক্ষা দিই। সংসারী হইবার জন্য ভবেশ-বাবু পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ; আমার প্রিয়তমা ভগিনী সুরবালা আমাকে সংসারে উদাসীন দেখিয়া একটু চোখের জলও ফেলিল। আমি কখনও দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াই, কখনও বা কয়েকমাস নির্জ্জনে পড়াশুনা করি। জীবন যখন বড় বৈচিত্র্যহীন

বলিয়া মনে হয়, তখন ভবেশ বাবুর বাড়ীতে গিয়া সুরবালার দুই বৎসরের ছেলে 'বুড়া'কে কোলেপিঠে লইয়া আমোদ করি।

একদিন অপরাহ্ণে বাড়ীতে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছি, এমন সময় ভবেশ বাবুর এক পত্র পাইলাম; তিন দিন হইতে রমণীর জ্বর-বিকারের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। সেই দিনই আমি রমণীকে দেখিতে ভবেশবাবুর বাড়ী যাত্রা করিলাম।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ভবেশ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। রমণীর শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ভবেশ বাবু ও সুরবালা রমণীর শয্যাপ্রান্তে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। ডাক্তার আধঘণ্টা পূর্ব্বে রমণীকে দেখিয়া গিয়াছেন; জীবনের আশা অতি অল্প, রাত্রি কাটে কি না, সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সব কথা শুনিলাম। রমণীর শয্যাপ্রান্তে বিহ্বলভাবে বসিয়া ধীরে ধীরে সকল কথা শুনিতে পাইলাম। আমার বক্ষে রক্তস্রোত স্তম্ভিত হইয়া গেল; ব্যাকুল-দৃষ্টিতে আমি একবার ইহলোকের পর-পারের সেই যাত্রীর দিকে চাহিলাম। তখন রমণীর সংজ্ঞা বিলুপ্ত; সেই দিন অপরাহ্ণ হইতেই রমণী অজ্ঞান—আমি মাথায় হাত দিয়া সেই একই স্থানে একভাবেই বসিয়া রহিলাম! সমস্ত দিনের পথশ্রমে দেহ অবসন্ন হইয়াছিল, মানসিক দুশ্চিন্তায় দেহের অব-সাদকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

রাত্রি প্রায় একটার সময় একবার রমণীর জ্ঞানসঞ্চার হইল। মনে হইল, চারিদিকে চাহিয়া সে যেন কাহাকে খুঁজিতেছে।

পাশ ফিরাইয়া দিলে রমণী আমাকে দেখিতে পাইল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার চক্ষে একটি অলৌকিক তীব্র জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলাম। ইহলোকের প্রান্তসীমায় সমুপস্থিত মরণাহত কোনও নর বা নারীর চক্ষে তেমন জ্যোতিঃ পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। রমণী অতি ধীরে আমার হাতখানি তাহার উভয় হস্তের মধ্যে টানিয়া লইল। একবার তাহার ওষ্ঠ নড়িল, যেন কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কথা ওষ্ঠ অতিক্রম করিতে পারিল না; আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "রমণী! কথা কহিতে কি বড় কষ্ট হইতেছে?" রমণী ক্ষীণস্বরে বলিল, "কষ্ট? না, কষ্ট কিছুই না, আমি চলিলাম। জানি, একদিন তুমিও আসিবে?"

রাত্রিশেষে সব শেষ হইয়া গেল। সুরবালা রমণীর বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। রমণীর মৃত্যুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন পাণ্ডুর মুখের দিকে আমি আর চাহিতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে রাজপথে আসিলাম। আকাশে চাঁদের আলো, বাতাসে ফুলের গন্ধ, বিজন রাজপথ, স্তব্ধপ্রকৃতি যেন নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন। আমি উন্মত্তের ন্যায় পথ বহিয়া চলিতে লাগিলাম। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিলাম। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ লোহিত হইয়া উঠিল; চন্দ্রকিরণ মলিন হইয়া গেল; বনান্তরালে বিহঙ্গের পক্ষান্দোলন কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল; মুক্ত-প্রান্তরের উপর দিয়া সুশীতল সমীরণ-প্রবাহ নিদ্রাতুর বিশ্বের নিঃশ্বাসের মত বহিয়া গেল; চরাচর ধ্বনিত করিয়া, আমার হৃদয় মথিত করিয়া কেবল একটা কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, "আর সময় নাই, আমি

চলিলাম।” যেন রাত্রি উষার রক্তিম অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বলিতেছে, “আর সময় নাই, আমি চলিলাম।” আকাশের চন্দ্র পশ্চিম-গগনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ম্লানদৃষ্টিতে ধরণীর দিকে চাহিয়া বলিতেছে, “আর সময় নাই, আমি চলিলাম।” নৈশবায়ু বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া, শুষ্কপত্র উড়াইয়া খোলামাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিতে চলিতে বলিতেছে, “আর সময় নাই, আমি চলিলাম।” জীবজগতের সুপ্তি যেন পূর্ব্বদিকে অঙ্গুলিপ্রসারণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, “আর সময় নাই, আমি চলিলাম।” আমার জীবনের দিন কবে ফুরাইবে? কবে আমি এ কথা বলিতে পারিব?

৫

সমস্ত দিন পথে পথে কাটিয়া গেল। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, পরিশ্রমে কষ্ট নাই। আমি রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিলাম। দ্বারে আঘাত করিতেই রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আমাকে দেখিয়া সে স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিয়া উঠিল, “খোকাবাবু! এত রাত্রে তুমি কোথা হ’তে আস্‌চো—খবর সব ভাল ত?”—রামচরণ প্রদীপ জ্বালিল।

দীপালোকে রামচরণ আমার মুখ দেখিয়া দুই হাত সরিয়া গেল; স্তম্ভিতের মত ক্ষণকাল আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; শেষে ব্যাকুলভাবে বলিল, “খোকাবাবু! তোমার এ অবস্থা কেন? কি হ’য়েছে খোকাবাবু?”

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, রামচরণকে সকল কথা—আমার জীবনের গুপ্ত ইতিহাস বলিয়া হৃদয়ভার লঘু করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া রামচরণ কাঁদিয়া ফেলিল; কথা কহিতে পারিল না। আমি হাত-পা ধুইয়া শয্যায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলাম। প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল;—তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম, রমণী আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—"আর সময় নাই, আমি চলিলাম!" চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, উন্মুক্ত গবাক্ষপথে অরুণের রক্তিমালোক আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, বৃদ্ধ রামচরণ আমার শিয়রে বসিয়া সস্নেহে আমার মস্তকে হাত বুলাইতেছে।—জীবনটাকেই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল।

বাড়ীতে আর মন টিকিল না। বাড়ীতে চাবি লাগাইয়া, দাসদাসীদের বিদায় দিয়া আমি দেশভ্রমণের আয়োজন করিলাম। মূল্যবান্ জিনিষপত্র যাহা কিছু ছিল, সমস্ত সুরবালার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। কোম্পানীর কাগজ, অলঙ্কারপত্র, পৈত্রিক সম্পত্তির দলিলাদি সমস্ত সুরবালাকে দান করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জানাইলাম, সংসারের সহিত আমার আর কোনও সম্বন্ধ নাই; যে কয়টি দিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে—দেশপর্য্যটন করিব। রামচরণ স্বয়ং সমস্ত জিনিস ও আমার পত্র সুরবালাকে দিয়া আসিল।

কিছু টাকাকড়ি ও রামচরণকে সঙ্গে লইয়া আমি এক সপ্তাহ-

মধ্যে দেশত্যাগ করিলাম। রামচরণকে সুরবালার কাছে গিয়া থাকিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার হুকুম তামিল করে নাই; সজলচক্ষে বলিয়াছিল, "খোকাবাবু! আমিই তোমাকে কোলে-পীঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি; এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, এত কঠিন দণ্ড দিতে চাও? বিদেশে তোমাকে দেখিবে শুনিবে কে?—এ বুড়োকে ছাড়িয়া যাইও না।"

তাই রামচরণ সেইদিন হইতে ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। আজ আমি স্বদেশ হইতে বহুদূরে পর্ব্বতের নিভৃত বক্ষের একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার আর কত বিলম্ব, তাহা জানি না; কিন্তু আর কতকাল এমন লক্ষ্যহীনভাবে, শ্রান্ত জীবনভার বহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইব?—রমণীর সেই অন্তিম কথা দিবানিশি আমার কাণে আসিয়া বাজিতেছে। আজ এই দিবা-অবসানে দুর্গম গিরিপ্রান্তে আমার এই ক্ষুদ্র, রুদ্ধদ্বার শয়নকক্ষে জগতের পরপ্রান্তবাসিনী, আমার জীবন-মরণের সাধনার ধন, আমার ইহলোকের আলোক ও পরলোকের অবলম্বন, আমার উভয় লোকের সর্ব্বস্ব—প্রেমময়ী ধৈর্য্যময়ী মহিমময়ী রমণীর সেই আশ্বাসবাণী ঐ আর্দ্র বায়ুহিল্লোলে ও বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্ শব্দে ভাসিয়া আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; আমার দেহ কণ্টকিত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আমার মনের ভাব মুখে প্রকাশিত না হউক, আমার অন্তরের ভাব অন্তরে অনুভব করিয়াই বৃদ্ধ রামচরণ আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে

বলিল "খোকাবাবু! এ পাহাড়ে মুলুক আর ত ভাল লাগে না ; চল, দেশে যাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যেতে হবে রামচরণ, দেশেই যাব ; বোধ করি, তার আর বেশী বিলম্ব নাই, কিন্তু এবার তোমাকে ফেলে একাই যাব।"

রামচরণ বোধ হয় কথাটা বুঝিল ; হাসিয়া বলিল, "খোকাবাবু! আমিই আগে যাব। আমি আগে না গেলে তোমার জন্য সংসার সাজিয়ে রাখ্‌বে কে ? এ বুড়োকে ছেড়ে তোমার এক দণ্ডও চলবে না যে।"

সমাজ-চিত্র

কোন বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমাকে একবার পূর্ব্ববাঙ্গালায় যাইতে হইয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা; তখন আমি কলিকাতায় থাকি। হাতে কোন কাজকর্ম্ম নাই; কাজকর্ম্ম করিবার উপযুক্ত চেষ্টা, যত্ন বা স্ফূর্ত্তিও তখন আমার ছিল না। মহানগরীর রাজপথে দিবারাত্রির অনেক অংশ কাটিয়া যাইত; আপনমনে লক্ষ্যহীনভাবে এই অট্টালিকারাশির মধ্যে আমি ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এমন সময়ে একজন পূর্ব্ববঙ্গবাসী বন্ধু তাঁহার গ্রামে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহানগরীর লোক-কোলাহল, রাস্তাঘাটের সেই একঘেয়ে ভাব পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামের দূরবিস্তৃত প্রান্তর, নীরব শীতল বৃক্ষের ছায়া, গ্রাম্য আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। বন্ধুর সাদর নিমন্ত্রণ তখনই গ্রহণ করিলাম। তিনি যাত্রার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, তারিখ মনে নাই; এক শুক্রবার রাত্রি দশটার গোয়ালন্দ মেলে আমাদের যাওয়া স্থির হইল। বন্ধু অনেক দিন পরে গৃহে যাইবেন; তাঁহার উৎসাহের অবধি নাই। আজ এক

সপ্তাহ হইল তিনি বাজারেই বাসা বাঁধিয়াছিলেন; বেলা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি চারিটি আহার করিয়া, কুরিয়ার-ব্যাগ গলায় ঝুলাইয়া বাজারে বাহির হন, আর রাত্রি সাড়ে সাতটা আটটার সময়ে ধূলিবিভূষিত সর্ব্বাঙ্গ ও ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাসায় ফিরিয়া আসেন; সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনটা ঝাঁকামুটে মাথার উপর বড়বাজার, চিনে-বাজার, রাধাবাজার, চাঁদনী সাজাইয়া প্রবেশ করে। সেই সব দরকারী, অল্প-দরকারী, অদরকারী দ্রব্যজাত গোছাইয়া হিসাব মিলাইয়া বাক্স, ট্রঙ্ক বোঝাই করিতেই রাত্রি এগারটা হইয়া যায়।

কয়দিন হইতে ক্রমাগত কলিকাতা সহরের জিনিস কিনিয়া আজ শুক্রবার অপরাহ্ণে বন্ধুবর জবাব দিলেন যে, তাঁহার যাহা কিছু কিনিবার ছিল, সকলই একরকম ক্রয় করা হইয়াছে। 'একরকম' শুনিয়া মনে হইল তিনি বুঝি আবার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য এখনই পুনরায় ধর্ম্মতলার দিকে ছোটেন। যাহা হউক, তিনি আর বাসার বাহির হইলেন না। সঙ্গে পাঁচ ছয়টা বড় বড় লগেজ, সুতরাং একটু সকাল-সকাল ষ্টেসনে যাওয়াই স্থির হইল। জিনিসপত্র, বোচকা-বুচকী কতক গাড়ীর মধ্যে কতক গাড়ীর ছাদে চাপাইয়া আমরা দুই বন্ধু যাত্রা করিলাম।

সিয়ালদহ ষ্টেসন-প্রাঙ্গণে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই এক দল নীল-ছোপ দেওয়া জামা ও পাগড়ীওয়ালা কুলী আমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল; তাহাদের সঙ্গে দস্তুর-দস্তুর করা আমার পোষাইয়া উঠিল না! সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর অবস্থায় বন্ধুবরকে পরি-

ত্যাগ করিয়া আমি ষ্টেসনগৃহে উপস্থিত হইলাম। গাড়ী ছাড়িবার তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব। আমি এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

বন্ধুবর শেষে রাশীকৃত লগেজের গতি করিয়া, টিকিট কিনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন; পশ্চাতে সেই সপ্তরথী-দল। তাহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিয়া দিবার জন্য বন্ধুকে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাহারা সহজে কি বিদায় হয়? ন্যায্য প্রাপ্যের ডবল পারিশ্রমিক আদায় করিয়াও বক্‌সিসের আব্‌দার ছাড়ে না। অনেক বাক্যব্যয় ও পয়সা ব্যয় করিয়া আমরা দুই বন্ধুতে একটি ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। গাড়ীর মধ্যে আরও দুইজন আরোহী ইতিপূর্ব্বেই বেঞ্চের অর্দ্ধেক-অর্দ্ধেক জুড়িয়া বিছানা পাতিয়া তাহার উপর উপবিষ্ট আছেন। আমাদের জিনিসপত্র সমস্তই লগেজ করা হইয়াছে, সঙ্গে সুধু একটা ঘটি ও গ্লাস, ছোট-ছোট দুইখানি সতরঞ্চি এবং ততোধিক ছোট দুইটি Dick's editionএর বালিস; গাড়ী ছাড়িবার অধিক বিলম্ব ছিল না; আমরা মনে করিলাম আজ রাত্রিটি একেবারে বসিয়া যাইতে হইবে না। যাঁহারা কখনও গোয়ালন্দ মেলে গিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, তৃতীয় ও মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে শুইয়া যাইবার সুবিধা অতি কম ভাগ্যবান জীবের অদৃষ্টেই ঘটে। আমরা আজ সেই ভাগ্যবান

গাড়ী ছাড়িবার পাঁচ মিনিট বিলম্ব আছে; আমি বালিসটির

উপর হেলান দিয়া শয়নের আয়োজন করিতেছি; বন্ধুবর গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া ষ্টেসন দেখিতেছেন, এমন সময়ে কে একজন আসিয়া গাড়ীর দ্বার ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। বন্ধু বলিলেন, "এ গাড়ীতে স্থান নাই, অন্য গাড়ীতে যান না মশায়।" তদুত্তরে একটা মোটা গম্ভীর আওয়াজ হইল, "ক্যান্, স্থান নাই ক্যান্; তামাম গ্যারীডা ভারা লইছ না কি?" আমি বুঝিলাম ব্যাপার গুরুতর; একবার মনে হইল উঠিয়া বসি এবং সেই সংগ্রামে বন্ধুবরকে সাহায্য করি; পরক্ষণেই মনে হইল "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে;" বাঙ্গালে-বাঙ্গালে কথাটাই নিষ্পত্তি হউক। কিন্তু আমার গো-বেচারী বন্ধু পরাজিত হইলেন; পূর্ব্ববঙ্গের সে তেজ তাঁহার শরীর হইতে অনেক দিন বিদায় লইয়াছে, নতুবা সেখানে, সেই প্লাটফরমে একটা 'গজকচ্ছপের' ব্যাপার হইত।

বন্ধুকে নরম দেখিয়া আগন্তুক গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন এবং একটা প্রকাণ্ড শরীর গাড়ীর দ্বাররোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সভয়ে চাহিয়া দেখিলাম যে বিরাশি তোলার ওজনে অন্যূন সাড়ে চারি মণ একটি হস্তপদাবিশিষ্ট জীব চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-আলোকের প্রবেশপথ রোধ করিয়া ক্ষুদ্র মধ্যশ্রেণীর একটি কম্পার্টমেণ্ট জুড়িয়া দণ্ডায়মান। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম। এই মানবশ্রেষ্ঠটি একলা হইলেও তাঁহার সঙ্গে দশ জনের লগেজ এবং তিনি সেগুলি ওজন করিবার সুযোগ প্রদান করেন নাই। ব্যাপার অতি গুরুতর; একবার মনে হইল

গার্ড সাহেবকে ডাকাইয়া তাঁহার বাক্স পেটারাগুলিকে ব্রেকভ্যানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা যাউক এবং সেই 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' ব্যক্তিটি single-টিকিটে যাইতে পারেন কি না, তাহারও একটা ব্যবস্থা করি; কিন্তু তখন বোধ হয় দুই মিনিটের অধিক সময় নাই; এই অল্প সময়ের মধ্যে বেচারীর অন্য গাড়ীতে যাওয়াও অসম্ভব এবং এতগুলি জিনিসপত্র লগেজ করাও ততোধিক অসম্ভব। কি করি, অগত্যা সেই রাশীকৃত জিনিস এবং সেই প্রকাণ্ডকায় মানবটিকে লইয়া কষ্টেসৃষ্টে রাত্রিবাসই স্থির করিলাম।

আগন্তুক মহাশয় তাঁহার জিনিসপত্র কতক বেঞ্চের নীচে, কতক দুই বেঞ্চের মধ্যে রাখিয়া আমার বন্ধুটি যে বেঞ্চে বসিয়া ছিলেন, সেই বেঞ্চে উপবেশন করিলেন; এবং আপন মনেই "বর গরম" "আর একটু থনেই গারী ফেল হইতাম" প্রভৃতি বলিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সমস্ত শরীরব্যাপী উদর, দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণনির্ম্মিত কবচ এবং খাঁটি ময়মনসিংহ জেলার কথা শুনিয়াই বুঝিয়াছিলাম, হয় ইনি স্বয়ং পাটের মহাজন, অথবা ততোধিক ভাগ্যবান—মহাজনের কলিকাতার প্রধান কর্ম্মচারী। কলিকাতা সহরে মহাজনটোলার ধনী মহাজন অপেক্ষা তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণেরই মানসম্ভ্রম, বাজারে খ্যাতি-প্রতিপত্তি অধিক। শেষে কথায়বার্ত্তায় আমার শেষোক্ত ধারণাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। এখন কাজকর্ম্মের গোলযোগ নাই; তাই গদিয়ান দিনকয়েকের জন্য একবার দেশে যাইতেছেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পাটের কর্ম্মচারী মহাশয় নিজের অতুল

ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তামাকু সেবন ;—ঢালা সাজা খাওয়া, আবার সাজা খাওয়া ঢালা। বেচারা সমস্ত রাত্রির মধ্যে নিজেও নিদ্রা গেলেন না, আমাদিগকেও নিদ্রা যাইতে দিলেন না। একে তামাকের গন্ধ, তাহার উপর হুঁকার সেই শ্রুতি-সুখকর হুঙ্কার সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। তাহারই মধ্যে যদি বা সামান্য একটু তন্দ্রা আসে, তখনই সেই গুরুগম্ভীরস্বরে "মোশাই, ঘুমালেন নাকি ?" প্রশ্ন! তাঁহার সেই রাজাবাদসাহ বধকাহিনীর এমন ধৈর্য্যশীল শ্রোতা বোধ হয় তাঁহার তাঁবেদার কর্ম্মচারী ব্যতীত আর কাহাকে তিনি কখন পান নাই। আমি তাঁহার সমস্ত কথায় বিনা-প্রতিবাদে সায় দিয়া যাইতে লাগিলাম ; লোকটি আমার উপরে বড়ই প্রসন্ন হইলেন।—এই প্রকারে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রত্যূষে আমরা গোয়ালন্দ ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে গাড়ী ত্যাগ করিয়া ষ্টীমারে উঠিতে হইবে। গোয়ালন্দ নামটি যেমন চিরপরিচিত, স্থানটি তেমন হইবার যো নাই। যে সর্ব্বগ্রাসিনী পদ্মানদী গোয়ালন্দের ক্রোড়বাহিনী, তাহার কাছে আর কাহারও দর্প, কাহারও অভিমান খাটে না! ইংরাজের সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত কৌশল, গোয়ালন্দের নীচে পদ্মার গর্ভে মুখ লুকাইয়াছে। ১৮৬৯ অব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত পদ্মা সমভাবে পূর্ব্ববঙ্গরেলওয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছে ; কত অর্থ যে ঐ রাক্ষসীর বিপুল উদরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কোম্পানির ক্ষতিতে সাধারণের কিছু যায় আসে না, কিন্তু বহু

পরিবার এই পদ্মার কোপে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; জমাজমী, অবশেষে বসতবাটী পর্য্যন্ত পদ্মার গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া প্রকাণ্ড পরিবার লইয়া সত্যসত্যই পথের ফকির হইয়াছে; আবার কত জন বা অতুল বিভবের অধীশ্বরও হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত কথা গোয়ালন্দ অঞ্চলের লোকের প্রতি খাটে না, কারণ আজ এই সাতাশ আটাশ বৎসরের ইতিহাস আমরা যাহা জানি, তাহাতে পদ্মার আক্রোশ গোয়ালন্দের দিকেই; অপরপারে প্রকাণ্ড চর পড়িতেছে। এখন যে স্থানকে গোয়ালন্দ বলে, তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব গোয়ালন্দের কোন সম্পর্কই নাই। স্থান কোথায় চলিয়া গিয়াছে, নামটি বরাবর চলিয়া আসিতেছে। ১৮৬৯ অব্দে যেখানে গোয়ালন্দ ছিল, তাহা এখন পদ্মার অপর পারে গ্রামরূপে পরিণত হইয়াছে। গোয়ালন্দের ইতিহাস লিখিবার জিনিস বটে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাব সে জন্য নহে,—ঘাটে ষ্টীমারে বংশীধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে!

আমরা নারায়ণগঞ্জগামী despatch ষ্টীমারে তাড়াতাড়ি উঠিলাম। আমরা কলিকাতা হইতে গন্তব্য-স্থানের টিকিট লইয়াছিলাম, গোয়ালন্দে আর আমাদিগকে টিকিট করিতে হইল না। আমাদের সঙ্গী পাটের মহাজন অপর ষ্টীমারে গেলেন, তিনি সিরাজগঞ্জের দিকে যাইবেন। আমরা সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য কিছুই লইলাম না, কারণ বেলা ১১ টার সময় আমাদিগকে এই ষ্টীমার ত্যাগ করিতে হইবে। প্রকাণ্ড ষ্টীমার ক্রোকোডাইল গোয়ালন্দ ছাড়িল। আমরা পদ্মার শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বন্ধুটির নিকটে এ দৃশ্য নূতন নহে, আমার নিকটেও নহে। আমি জীবনের দীর্ঘ

এক যুগ এই দূরপ্লাবী পদ্মার তীরে কাটাইয়াছি ; আমার জীবনের মধুর শৈশবকাল এই খরস্রোতার তীরে কত আনন্দে অতিবাহিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে বসিয়া ভবিষ্যৎ-জীবনের কত সুন্দর মনোমোহন আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছি! সে দিন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখন সুধু সেই স্বর্গ-স্বপ্নময় সময়ের স্মৃতির দংশনে মর্ম্ম-পীড়া অনুভব করি।

বন্ধুর সঙ্গে যে দিন তাঁহার জন্মভূমির উদ্দেশে যাত্রা করি, তখন আমার জীবনের অতি শোচনীয় সময়; আমার সংসার-বন্ধন তখন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। যেখানে-সেখানে, যেন-তেন-প্রকারে দিন কয়টা কাটিয়া গেলেই আমি অব্যাহতি পাই। পদ্মার সেই স্থির গম্ভীর শোভা অনুভব করিবার শক্তি তখন আমার অপহৃত হইয়াছে;—আমি তখন একটা প্রাণহীন আবছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এইস্থান হইতে আমাকে কিছু গোপন করিতে হইতেছে। আমরা যে ষ্টীমার-ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম, তাহা পাঠকগণের নিকট বলিতে পারিতেছি না, এবং যে গণ্ডগ্রামে আমাদের এই ভ্রমণের পরিসমাপ্তি, নানাকারণে তাহার নামও বলা সঙ্গত মনে করিতেছি না। এই প্রস্তাব আদ্যন্ত পাঠ করিলেই আমার কথা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ষ্টেসনে নামিয়াই দেখিলাম আমাদের জন্য একখানি ক্ষুদ্র নৌকা প্রস্তুত; বন্ধু পূর্ব্বেই বাড়ীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাই এই ক্ষুদ্র তরণী আমাদের জন্য ষ্টীমারঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল।

আমরা কালবিলম্ব না করিয়া সেই নৌকায় উঠিলাম। নৌকার মাঝি বর্ষীয়ান ব্যক্তি, কিন্তু দাঁড়ি সবে একজন, সেও মাঝির একাদশবর্ষ বয়স্ক নাবালক পুত্র। এই দুইজনের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র নৌকা তীরভূমি ত্যাগ করিল। মাঝি নৌকাচালনে এমনই কৃতকর্ম্মা এবং সেই নাবালক মাঝিপুত্র ক্ষেপনী-নিক্ষেপে এমনই সিদ্ধহস্ত যে, নৌকা নাচিতে নাচিতে পদ্মাবক্ষে চলিতে লাগিল! বন্ধু বলিলেন, "রামচরণ মাঝি দ্বিতীয় লোকটি না লইয়া একেলা ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যেও এই ছোট নৌকায় পদ্মায় পাড়ী জমাইতে পারে; আর তাহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন দুর্দ্দিন অনেক উপস্থিত হইয়াছে।" মাঝির মুখে তাহার adventure শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইল। তাহাকে অনুরোধ করায় সে তাহার নৌ-জীবনের আশ্চর্য্য কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। আমি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া তাহার অতুল সাহস, বিপুল বীর্য্যের বিবরণ শুনিতে লাগিলাম; শুনিতে শুনিতে কখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, কখন ইচ্ছা করিল সেই ধীরব-সন্তানকে আলিঙ্গন করি। যাত্রীর প্রাণরক্ষার জন্য কতবার সে ঘোর তুফানের সময় উত্তাল তরঙ্গময় পদ্মাবক্ষে নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ঝাঁপ দিয়াছে। একবার একটি বিধবার একমাত্র অবলম্বন একটি ছেলেকে মধ্য-পদ্মা হইতে কিনারা পর্য্যন্ত আনিয়া তাহার মায়ের কোলে দিয়াছিল। ঘোর দুর্দ্দিনে যখন নদীর মধ্যে কোন নৌকা ডুবিয়া যাইত, তখন রামচরণ তাহার ঐ ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া একাকী নৌকা-ডুবি লোকদিগের উদ্ধারের

জন্য যাইত। দরিদ্র ধীবরের আত্মপ্রাণের মায়া বিসর্জ্জনের এ পবিত্র ইতিহাস কয়জন জানে? কয়জন রামচরণকে চিনে? কয়জন তাহার গুণের আদর করে? পূর্ব্ববঙ্গের এক ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীর, ততোধিক নগণ্য কুটীরে বিকট দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া রামচরণের দেবদুর্লভ পবিত্র জীবন কাটিয়া গিয়াছে। আজ সে এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে কি না, সে সংবাদও আমি রাখি না। কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে:—

"Full many a flower is born to blush unseen,

And waste its sweetness on the desert air."

পদ্মার বক্ষে নিরক্ষর, দেবহৃদয় কত মাঝি আছে, তাহা কে জানে, আর কেই বা তাহার সন্ধান লয়, কেই বা তাহার পুরস্কার করে।

এই সময়ের মধ্যে আমাদের ডিঙ্গীনৌকা পদ্মা ছাড়িয়া একটা খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রামচরণ আমাদের সঙ্গে গল্প করিতেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আপন কাজও করিতেছে। এই খালের ধারেই আমার বন্ধুর গৃহ। খাল দিয়া প্রায় দুই ক্রোশ পথ যাইয়া আমরা ঘাটে পৌছিলাম। আমার বন্ধুর পিতা বেলা ১টা হইতে ঘাটে আসিয়া বসিয়া আছেন। কখন আমরা আসিয়া পৌছিব তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু যে সময়ে সাধারণতঃ রেলের লোক গ্রামের ঘাটে আসিয়া পৌছে, বৃদ্ধ সেই সময় হইতে ঘাটে বসিয়া আছেন। পুত্র-স্নেহের এমনই টান! দূর হইতে ঘাটের উপর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিয়া বন্ধু ভক্তিগদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "ঐ দেখুন, আমার বাবা ঘাটে অপেক্ষা করিতেছেন।" অতি বাল্যকালে

পিতৃহীন; আমি এ পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া বড়ই কাতর হইলাম; আমার প্রাণে একটা অভাব জাগিয়া উঠিল। হায়! হতভাগ্য আমি পিতৃমাতৃহীন; জীবনের এ উপকূলে আর আমার জন্য বৃদ্ধ পিতা পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন না, গৃহপ্রাঙ্গণে সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমা জননী আর স্নেহকোমল বাহু প্রসারিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রাণান্ত আগ্রহে অপেক্ষা করিবেন না। এ হতভাগ্য জীবনে সে সুখের দিন আর আসিবে না। বন্ধুর পিতার ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া আমার পিতৃমাতৃহীন অবস্থা বড়ই প্রাণে বাজিল।

নৌকা তীরে লাগিবার অপেক্ষা সহিল না; তীর-সংলগ্ন হইতে না হইতেই আমার বন্ধুটি নৌকা হইতে খালিপায়ে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি গিয়া বৃদ্ধের চরণ-বন্দনা করিলেন। বৃদ্ধ প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে একেবারে কোলের মধ্যে লইয়া, বুকে চাপিয়া ধরিলেন। আমি অবাক্ হইয়া এই শোক-তাপ-দুঃখ-যন্ত্রণাময় মরজগতে স্বর্গের অভিনয় দেখিতে লাগিলাম, নৌকা হইতে যে বাহির হইব, সে কথাও ভুলিয়া গেলাম। শেষে আমার বন্ধু যখন আমাকে ডাকিলেন, তখন বিশেষ অপ্রস্তুতভাবে আমি নৌকা হইতে তীরে উঠিলাম এবং বৃদ্ধকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধ আমাকেও প্রাণের উচ্ছলিত আনন্দের বেগে আলিঙ্গন করিলেন এবং কত আদরের সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাল্যকাল হইতে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত; আজ এই বৃদ্ধের আদরে আমার প্রাণের এক নিভৃত কোণে পিতৃভক্তি জাগিয়া উঠিল।

বৃদ্ধের ডাকাডাকিতে বাড়ী হইতে ভৃত্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার বন্ধুর খুল্লতাত আসিলেন। তাঁহার মুখেও তেমনি প্রসন্নতা ; তিনিও আমাকে কত আদর অভ্যর্থনা করিলেন। শেষে সকলে একসঙ্গে বাড়ীর দিকে চলিলাম ; বাড়ী ঘাটের অতি নিকটে।

ঘরের ছেলে প্রায় দেড় বৎসর পরে ঘরে আসিয়াছেন এবং সঙ্গে আমি এক মহাসম্মানিত অতিথি ; বাড়ীতে যে একটা আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল, সে কথা না বলিলেও চলে। আমার সম্বন্ধে বন্ধুবর তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মনে পূর্ব্বেই চিঠি পত্রে এমন একটা ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমি এতকাল চেষ্টা করিয়াও আমার প্রকৃত মূল্য তাঁহাদিগকে জানাইতে পারিলাম না। পূর্ব্ব-বঙ্গের লোকের প্রাণ বড়ই ধর্ম্মপিপাসু ; কেহ যদি দুইটা ধর্ম্মের কথা বলিল, বা দশটা দেহতত্ত্বের গান করিল, তাহা হইলে তাহার পসার প্রতিপত্তির অবধি থাকে না। আমিও নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ এই রকমের কিছু করিয়া ফেলিয়া সর্ব্বদাই নিজেকে অপরাধী মনে করি এবং নিজের বিশ্বাসহীনতা ও দুর্ব্বলতার জন্য নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিই।

তিন দিন বন্ধুগৃহে আনন্দ-উল্লাসে কাটিয়া গেল। চতুর্থদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম, আমার বন্ধুর এক প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের বাড়ীতে বিবাহ। বহুদিন হইতে পূর্ব্ববঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী কুলীন ব্রাহ্মণগণের বিবাহ সম্বন্ধে নানাপ্রকার হৃদয়ভেদী গল্প শুনিয়া আসিয়াছি। মানুষ যে এত নৃশংস, এত কঠিন-হৃদয়

হইতে পারে, পিতা-ভ্রাতার স্নেহপ্রবণ হৃদয় দুহিতা বা ভগিনীর জন্য এমন করিয়া আমরণ তুষানলের ব্যবস্থা করিতে পারে, সে কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইত না। বন্ধুর প্রতিবেশী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে যে বিবাহের অনুষ্ঠান হইবে, তাহাতে ঐ প্রকার কিছু আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার প্রশ্ন শুনিয়া বন্ধুর খুড়ামহাশয় সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন আমরা দুই বন্ধুতে সেই বাড়ীর বিবাহ সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলাম। আমাদের যাহা কথাবার্ত্তা হইল, তাহা না বলিয়া সেই শুভদিনে কতকগুলি ভদ্রনামধারী, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান কেমন করিয়া এগারটি দুর্লভ জীবন বলিদান করিয়াছিল, তাহাই বলিব।

শুনিলাম আমার বন্ধুগৃহেই বরপক্ষীয়গণের বাসাবাড়ী হইয়াছে। তাঁহারা অতি দূর ক——গ্রাম হইতে অদ্য দুইপ্রহরের মধ্যেই আসিয়া পৌছিবেন। বর এক যাত্রায়, এক লগ্নে, এক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, একাসনে উপবিষ্ট হইয়া, এক নিঃশ্বাসেই এগারটি কুমারীকে সধবা-শ্রেণীতে উন্নীত করিবেন। আর্য্যশক্তির মহান্ তেজের কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত!

আমরা বিশেষ উৎসাহের সহিত বরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা যখন দুইটা বাজে, সেই সময়ে একখানি নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল; এবং সেই নৌকা হইতে তিনটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও একজন চাকর (বোধ হয় সে নাপিত) নামিলেন এবং ধীরেধীরে আমার বন্ধু-গৃহের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমি বারান্দায়

বসিয়াছিলাম, ঘরের মধ্যে গেলাম। দেখিলাম তিনটি অশীতি-পর বৃদ্ধ ; ইহার মধ্যে বরজাতীয় জীব ত দেখিতে পাইতেছি না। এমন সময়ে আমার বন্ধু সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "ঐ তিন জনের মধ্যে যিনি বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ, তিনিই বর।" আমার একেবারে চক্ষুস্থির! যাঁহাকে আজ অপরাহ্ণে আমি অনায়াসে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিতে পারি, তিনি আজ রাত্রে বিবাহ করিতে যাইবেন! আমার কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত অপহৃত হইল। আমি বাহিরে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

বর আসিয়াছে শুনিয়া পাড়ার মেয়েছেলেরা সকলে ছুটিয়া দেখিতে আসিল ; আর তাহার ক্ষণকাল পরেই ক্রন্দনের শব্দে পাড়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমার বন্ধুগৃহে যে ক্রন্দনের রোল উঠিল, তাহা শুনিয়াই বিবাহ-বাড়ীতেও কান্না পড়িয়া গেল। আমার বোধ হইল, অকস্মাৎ যেন পাড়ায় বজ্রাঘাত হইয়াছে। সেই ক্রন্দনের রোল, সে বিলাপধ্বনি, আর সন্ধ্যার সময় যে প্রেতভূমির দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার মনে জাগরূক থাকিবে।

নির্লজ্জ বৃদ্ধ ও ততোধিক নির্লজ্জ সঙ্গীদ্বয় তামাকুসেবন, হাস্য-পরিহাস ও খোসগল্প করিতে লাগিলেন। আমার একএকবার ইচ্ছা হইল, তাঁহাদের নিকটে গিয়া বসি এবং এ চামারের ব্যবসায় সম্বন্ধে দুই চারিটি তীব্র কথা শুনাইয়া দিই ; কিন্তু তাহাতে গৃহস্থের

এত সাধের "শুভ বিবাহোৎসব" স্থগিত হইবার কোন আশা নাই, এই ভাবিয়া বিরত হইলাম।

সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দন সেই যে বেলা দুইটা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার আর বিরাম নাই। সন্ধ্যার সময়ে যখন বিবাহবাড়ীতে দুইটি ঢোল ও তাহার সঙ্গে একটি সানাই বাজিয়া উঠিল, তখন সেই সানাইয়ের পুরবী রাগিণীর সঙ্গে একটা গভীর বেদনা যেন অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে লাগিল; সমস্ত গ্রামের উপর দিয়া যেন একটা শোক ও বিষাদের তরঙ্গ আকুলভাবে ভাসিয়া যাইতে লাগিল; বৃক্ষলতা নীরবে যেন সেই অসহায়া রমণীগণের বলিদান দেখিবার জন্য স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রকৃতি যেন ঘনকৃষ্ণ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছেন; আর সেই সানাইটি হৃদয়ের সমস্ত শোকতাপ ঢালিয়া দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের চরণে "অবলাকে রক্ষা কর" বলিয়া মিনতি করিতেছে!

গোধূলিলগ্নে বিবাহ; সন্ধ্যার সময়েই এই প্রেতভূমিতে শ্মশান-দৃশ্যের অভিনয় হইবে। শেষে কি হয়, দেখিবার জন্য বরপক্ষীয় বৃদ্ধত্রয়ের পূর্ব্বেই আমরা বিবাহবাটীতে উপস্থিত হইলাম। বর সমাগত হইলেন; মন্ত্রাদি পাঠ হইল। এ যে বিবাহসভা, তাহা ত মনে হইল না; আমার মনে হইতে লাগিল, গৃহস্থের অন্তঃপুর হইতে এক একটি শব বাহিরে আসিবে, আর আমরা সেই শব শ্মশানভূমে লইয়া যাইবার জন্য এখানে প্রতীক্ষা করিতেছি।

এখন ক'নে আসিবার সময়। আমি সে পৈশাচিক দৃশ্য বর্ণন

করিতে পারিব না ; আমার সাধ্য নাই যে, সেই নিরাশ্রয়া অবলা-গণের অসহায় মলিন মুখের কথা বলি। তাহাদের সেই অশ্রুকাতর দৃষ্টি, হৃদয়ভেদী ক্রন্দন, সেই মৃত্যুগ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অন্তিম-চেষ্টা, শেষ বলপ্রকাশ,—এ দৃশ্য বর্ণনার বিষয় নহে। পিশাচের ভাষা পাইলে,অসুরের মত হৃদয় পাইলে, আর কৌলীন্য-অন্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় হইলে বুঝি সব কথা,—যেটি যেমন হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারিতাম। অশীতি-বৎসরের কুমারী হইতে আরম্ভ করিয়া সাড়ে তিন বৎসরের বালিকা, এই রকম এগারটি মেয়ে সভাস্থলে, শ্মশানভূমিতে আনীত হইল। একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতীর করুণক্রন্দনে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। একবার মনে হইল যাহা হইবার হইবে, এই অসহায়া কুমারীদিগকে জোরে ছাড়াইয়া লইয়া যাই ; শেষে না হয় তাহা-দিগকে পদ্মার খরস্রোতে ভাসাইয়া দিব ; তাহা হইলেও তাহারা শান্তি পাইবে। পাঠক ! এ দৃশ্য আর দেখিয়া কাজ নাই।

N, B,—এই বিবাহের দেড়মাস পরেই সেই বৃদ্ধটি ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহ এই এগারটি লইয়া মোট ছত্রিশটি।

এ অত্যাচারের কি বিচার নাই ? কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"এপারে ইহার হোল না বিচার,
হয় যদি পরপারে।"

কবি।

১

দাদা যেবার বি, এল্‌, পরীক্ষা দেন, আমি সেইবার গ্রামের স্কুল হইতে এণ্ট্রাস পাশ করি। বাবা বলিয়াছিলেন, আমি যদি বৃত্তি না পাই, তাহা হইলে বহরমপুরে পিসিমার কাছে থাকিয়া আমাকে কলেজে পড়িতে হইবে। পিসিমার বাড়ীতে থাকিতে হইবে ভয়ে আমি প্রাণপণে পড়ায় মন দিয়াছিলাম;—যেমন করিয়া হউক বৃত্তি লইতেই হইবে; তাহা হইলে দাদার কাছে থাকিয়া কলিকাতায় পড়িব। পিসিমার ছেলে নবীন বড় মাতাল। সতর বৎসরের ছেলে, আমার দুই বৎসরের বড়; কিন্তু ইহারই মধ্যে মদ খাইতে শিখিয়াছে! বহরমপুরে পিসিমার কাছে আমি কিছুতেই যাইব না।

ভগবান আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছিলেন; আমি পনর টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় পড়িতে গেলাম। বাবার আদেশ-মত দাদা আমায় প্রেসিডেন্সি-কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন; দাদা যে মেসে থাকিতেন, আমাকেও সেখানেই রাখিলেন—আমি আর দাদা এক কামরায় থাকিলাম।

প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছি সুতরাং কাহারও নিকটই বড় যাইতাম না; বিশেষ মুখচোরা বলিয়া আমার একটা অখ্যাতি

আছে। দেশে থাকিতে যদি বা তুইচারিটা কথা বলিতাম; কিন্তু কলিকাতার ছেলেদের মুখ দিয়া তুবড়ী ছুটিতে দেখিয়া আমি একেবারে এতটুকু হইয়া গেলাম; কথা বলিতে ভয় করিত। সুশীল ও সুবোধ বালকের মত কলেজে যাইতাম; কলেজ হইতে আসিয়াই আমার নির্দ্দিষ্ট কেওড়াকাঠের চৌকীর উপর বসিয়া পড়াশুনা করিতাম। দাদার সঙ্গ ছাড়া কখন রাস্তায় বাহির হইতাম না। মেসের ছেলেরা সকলে আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত; এবং আমার মত একটা বোকা ছেলে যে পনর টাকা বৃত্তি লইয়া আসিয়াছে, ইহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উপর যথেষ্ট দোষারোপ করিত। সুধু ইহাই নহে, অনেক সময়ে, এমন কি আমার সম্মুখেই, আমাকে "পাড়াগেঁয়ে ভূত" বলিয়া কমপ্লিমেণ্ট দিত; কিন্তু আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, আমাদের মেসে যে কয়েকজন ছাত্র ছিলেন, সকলেই পাড়াগেঁয়ে;—আমাদের গ্রাম তবুও একটু সহরের মত; তাঁহাদের গ্রামে হাটবাজার পর্য্যন্তও নাই! কিন্তু তাঁহারা কলিকাতায় বাস হিসাবে আমার সিনিয়র; কেহ তুই বৎসর, কেহ তিন বৎসর, কেহ বা চারি বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

আমরা যে ঘরে থাকিতাম, সে ঘরে অন্য কেহ বড় আসিতেন না, কারণ দাদা তখন বি, এল্, পরীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যস্ত; আমিও সেই সুবিধায়—বিনা উৎপীড়নে—পড়াশুনা করিতাম। একটি ছাত্র কিন্তু সময়ে সময়ে অতি ধীরপদবিক্ষেপে দাদার নিকটে আসিয়া বসিতেন, এবং অতি মিহি-আওয়াজে, মৃদুস্বরে দাদার সঙ্গে

টেনিসন, সেলি, ওয়ার্ডসোয়ার্থ বাইরণ, সুইনবারণ প্রভৃতি কবি-গণের সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতেন। দাদার প্রসাদে স্কুলে পড়িবার সময়েই আমার ঐ সকল কবির দুই চারিটি কবিতা পড়া হইয়াছিল; কিন্তু মহেন্দ্র বাবুর ন্যায় অল্পবয়সী যুবকের এতাদৃশী জ্ঞান, এত কবিতাপাঠ, এত কাব্য-সমালোচনা শুনিয়া আমি একটু দমিয়া গিয়াছিলাম। মহেন্দ্র বাবু আমার অপেক্ষা বড় বেশী হয় ত তিন চারি বৎসরের বড়, অথচ তিনি কেমন পণ্ডিত!

এই স্থানে মহেন্দ্র বাবুর একটু পরিচয় দিতে হইতেছে। মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী দাদার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে। মহেন্দ্রের পিতা-পিতামহ সেই গ্রামের বনিয়াদী জমিদার মুখুয্যে-বাবুদের বাড়ীর ভাণ্ডারীগিরি করিত; এই জন্য তাহাদের পদবীই 'ভাণ্ডারী' হইয়াছিল। মুখুয্যে বাবুদের মেজবাবু মহেন্দ্রকে বড়ই ভাল বাসিতেন; তিনিই মহেন্দ্রকে শ্যামপুরের এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মহেন্দ্র যেবার এণ্ট্রাস পরীক্ষা দেন, সেইবার অনেক চেষ্টা করিয়া নিজের পদবী বদলাইয়া লন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন, দুই দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইবেন, আর তাঁর নাম কি না হইবে মহেন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী! আরে ছি! মহেন্দ্র এমন অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। চিরদিন দাসত্বের কলঙ্ক-রেখা তিনি নামের সঙ্গে কিছুতেই বহিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং জীবন-ভাণ্ডারীর ছেলে মহেন্দ্রনাথ তরফদার হইয়া গেল।

এ সব কথা দাদার মুখে শুনিয়াছি। মহেন্দ্র বাবু—বাবু না বলিলে তিনি নাকি বড় চটেন—এখন এলে পড়িতেছেন; গত দুই

বৎসরই এলে ফেল করিয়াছিলেন; এবারও পরীক্ষা দিবেন। একটা প্রাইভেট-টিউসনী করিয়া পনরটি টাকা পান; তাহাতেই তাঁহার খরচ চলে।

কলিকাতায় আসিয়া অবধি মেসের ছাত্রগণের মধ্যে মহেন্দ্র বাবুকেই বেশী জ্ঞানী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কারণ তিনি অল্প-ভাষী, নির্জ্জন-প্রিয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেশ বাবু রকমের লোক। তিনি যে ঘরটিতে থাকেন, তাহাতে একজনের বেশী থাকিবার যো নাই; সে ঘরটি বেশ সাজানো, ছোট খাটো, কবিকুঞ্জ বলিলেই হয়। কিন্তু যে দিন দাদার কাছে শুনিলাম, মহেন্দ্র বাবু বাড়ীতে যান না, মা বাপের খোঁজও লন না, সেই দিন হইতেই তাঁহার উপর আমার যেন কেমন একটু অশ্রদ্ধার উদয় হইল। দুইখানি সাবান, তিনখানি তোয়ালে, দেড়গণ্ডা আয়না ব্রুশ না হইলে তাঁহার চলে না; মাথার চুলগুলি লম্বা, বেশ কোঁকড়ান, চসমাখানি সোনা দিয়ে বাঁধানো, থানের ধুতি পরিধান, ধব্‌ধবে জামা গায়, এসব যেন জীবন ভাণ্ডারীর ছেলের গায় থাপ খায় না বলিয়া আমার মনে হইত। সুতরাং যখনই মহেন্দ্র বাবুকে দেখিতাম, তখনই সেলি, বাইরণ, কি রবি বাবুর কথা মনে না হইয়া আমার কল্পনায় গঠিত জীবন ভাণ্ডারীর ছেলের কথা মনে হইত।

৮

মহেন্দ্র বাবু আমাদের ঘরে আসিতেন, কিন্তু আমার সহিত কথা কহিতেন না; তিনি আমাকে নিতান্ত নাবালক-শ্রেণীতে

ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন—তবুও সবে তিন চারি বৎসরের বড় এবং দুইবার এলে ফেল। আমার মনে একটু আঘাত লাগিত। বাসার অন্যান্য ছেলেরা পাড়াগেঁয়ে বলিয়া নাক্ শিট্‌কাইত, তাহাতেই যেন আমার মনুষ্যত্ব নামক পদার্থটা বেশ একটু আহত হইত; তাহার পর জীবন ভাণ্ডারীর ছেলেও যে আমাকে নিতান্ত নাবালক, বোকা বলিয়া উপেক্ষা করিত, তাহা আর প্রাণে সহিত না। দাদাকেই তিনি তাহার সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেন। আমার দাদাও ত খুব লোক; তিনি মহেন্দ্রবাবুকে সকল বিষয়েই বাড়াইয়া দিতেন। দাদার মত এম, এ, পাশ করা একজন বিদ্বান ব্যক্তি যে মহেন্দ্র বাবুর প্রতিভার পরিমাণ করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ হইত। আমি কিন্তু ভাবিতাম শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের লোক বলিয়াই দাদা মহেন্দ্র বাবুর প্রতিভার জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতেন এবং পরোক্ষ-ভাবে মহেন্দ্র বাবুর পরীক্ষার দ্বারে অর্গলবন্ধের ব্যবস্থা করিতেন। মহেন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে দাদাকে দুই একটি স্বরচিত কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন; সুর করিয়া, হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া, চোক মুখ টানিয়া কবিতা পাঠ করিতেন। কবিতা শেষ হইলে দাদা বলিতেন "বেশ,—sublime;" আমি মনে মনে বলিতাম, এ পাপ বিদায় হবে কতক্ষণে। শ্বশুরের গ্রামের সকলই কি sublime! কথাটা বাড়ীতে গিয়া বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

মহেন্দ্র বাবু আমার কিন্তু এক উপকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম প্রথম কলিকাতায় আসিয়া মহেন্দ্র বাবুর

বিদ্যা দেখিয়া আমার মনটা কেমন দমিয়া গিয়াছিল। আমি তখন স্থির করিয়াছিলাম, কলেজের পড়া গোছান হইয়া গেলে, ইংরাজ-কবিগণের বই এক একখানি করিয়া পড়িব। আমি তাই পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বাড়ী হইতে আসিবার সময় মা আমাকে ৫০টি টাকা দিয়াছিলেন। আমি সেই কয়টি টাকা দাদার হাতে দিই নাই। সেই টাকা কিছু খরচ করিয়া বই কিনিয়াছিলাম, এবং বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে সেই সব বই পড়িতাম! যেখানে বুঝিতাম না, তাহাতে দাগ দিয়া রাখিতাম; দাদাকে জিজ্ঞাসা করিতাম না, পাছে তিনি বিরক্ত হন; মনে করিয়াছিলাম পূজার ছুটিতে বাড়ী গেলে বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইব—বাবা সেকেলে সিনিয়ার স্কলার।

বড়ই বিপদে পড়িয়াছি! দাদা পরীক্ষা দিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা নূতন একটা বাড়ীতে মেস করিয়াছি। দাদা কলিকাতা ত্যাগের সময়ে তাঁহার এই নিতান্ত ভালমানুষ ভাইটিকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর পরিচিত, দীর্ঘ কুঞ্চিত-কেশ, সোণার চসমাধারী কবিবর মহেন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এখন আমি আর মহেন্দ্র বাবু এক ঘরে থাকি। দিন নাই, রাত্রি নাই, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, মহেন্দ্র বাবুর কবিতার জ্বালায় আমি অস্থির। একে কবির প্রতিভা, তাহার পর মুরুব্বীয়ানার প্রভাব, আমি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। সেই ৪৫

মিনিটব্যাপী চুল আঁচড়ান, সেই টেবিলের উপর ফুলের তোড়া, আর সেই সেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বাইরণ, রবীন্দ্র বাবু, অক্ষয় বড়াল, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস! আর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক সেই কাগজের বাঁধা খাতা! পড়াশুনা যে বন্ধ হইবার যো হইল। শরীরেও আর সয় না। পূজার পরে পৌষ মাসে কন্‌-কনে শীত; মহেন্দ্র বাবু সেই শীতের রাত্রেও রাস্তার উপর উত্তর-দিকের জানালা খুলিয়া চাঁদিনী-যামিনী উপভোগ করিতেন, আর এদিকে ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার ওষ্ঠাগত-প্রাণ! একটু স্থির শান্ত হইয়া একটা কঠিন অঙ্ক লইয়া বসিয়াছি; আর অমনি মহেন্দ্র বাবুর চেয়ার হইতে গীতধ্বনি উত্থিত হইল—

"এ মধু যামিনী, চাঁদিনী রজনী
সে যদি গো সুধু—আসিত।"

কে যে আসিবে, তাহা ত আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না! আর চাঁদিনী রজনীর কথা যদি বলেন, তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তেমন ঘুরঘুট্টে অন্ধকার কুয়াসাময়ী রজনী পৌষ মাসে অতি কমই হয়! এই কেমিক্যাল-কবির জ্বালায় দেশ ছাড়িব না কি?

তাহার পর 'সাহিত্য-সম্পাদক' সুরেশ বাবু আর এক অনর্থ বাধাইয়া দিয়াছেন। একবার 'সাহিত্যের' বুঝি প্রবন্ধের অভাব হইয়াছিল; সেবার তিনি পুরাতন দপ্তর খুলিয়া কয়েকটী কবিতা 'সাহিত্যে' প্রকাশ করিয়াছিলেন; আর তাহারই মধ্যে 'শ্রীমহেন্দ্রনাথ তরফদার' স্বাক্ষরিত এক বিকট কবিতা স্থান

পাইয়াছিল। মহেন্দ্র বাবু সেই মাস হইতে ‘সাহিত্যের’ গ্রাহক হইয়াছেন; আর সেই সংখ্যার কাগজখানি কিনিয়া বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন; পাছে কেহ ‘অভিমান’ শীর্ষক ‘শ্রীমহেন্দ্রনাথ তরফদার’ স্বাক্ষরিত কবিতাটী দেখিতে না পায়, তাহার জন্য সেই কবিতাটীতে লাল পেন্সিলের দাগ দিয়া দিয়াছেন। একে মা মনসা, তায় ধূনার গন্ধ! জ্বালাতন গো, জ্বালাতন! কিন্তু তাও বলি, আমার ন্যায় নির্ব্বাক, সুতরাং সমজদার শ্রোতা তাঁহার কবিজীবনে তিনি পান নাই;—আমি তাঁহার কবিজীবনের সমস্ত অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিতাম।

কবি মহেন্দ্রনাথের “এত প্রেম আশা, প্রাণের তিয়াসা” যে মেসের ঝি, বামুন এবং আমার ন্যায় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দহীন শ্রোতার কর্ণে-ঢালিয়া পরিতৃপ্ত হইবে, এ আশা করাই অন্যায়! আমিও মনে মনে ভাবিতাম, কবি মহেন্দ্রনাথের প্রেম-প্রবাহিনীতে শীঘ্রই একটা ঘোর বান ডাকিবে, এবং সেই বানের খরপ্রবাহে রিপন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীটের দ্বিতল গৃহ, জীবন ভাণ্ডারীর খাতায়-খরচলেখা বংশধর, সব কোথায় ভাসিয়া যাইবে।

আমার কথাই ফলিল। একদিন অপরাহ্ণে কলেজ হইতে আসিয়া দেখি, মহেন্দ্র বাবু জিনিসপত্র সমস্ত বাঁধিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, “নলিন, আমার পশ্চিমে চাকুরী হইয়াছে; আর পরীক্ষা দিব না। আজ রাত্রের মেলেই রওয়ানা হইতে হইবে। আমার জিনিসপত্র যাহা কিছু দরকার, লইয়া

গেলাম ; অবশিষ্টগুলি তুমি ব্যবহার করিও। আমি কানপুরে পৌছিয়া তোমাকে পত্র লিখিব।"

তিনি কানপুরে চাকুরী পাইয়া যাইতেছেন শুনিয়া আমার আনন্দ হইল; আমিও তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পরে মেসের হিসাবপত্র বুঝাইয়া দিয়া, একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই দিয়া মহেন্দ্র বাবু কানপুরে চাকুরী করিতে গেলেন।

রাত্রি যখন এগারটা, তখন একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া আমাদের মেসের দ্বারে লাগিল। গাড়ীর মধ্য হইতে একটি বাবু নামিয়া বরাবর উপরে উঠিয়া আসিলেন; তাঁহার সঙ্গে একটি বার তের বৎসরের ছেলে; এই ছেলেটিকেই মহেন্দ্র বাবু পড়াইতেন। ছেলেটি আরও তিনচারিদিন মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমাদের মেসে আসিয়াছিল। তাঁহারা বরাবর আমাদের ঘরে আসিলেন এবং ঘরে আমাকে একাকী দেখিয়া মহেন্দ্র বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—"তিনি আজ রাত্রের মেলট্রেণে চাকুরী করিবার জন্য কানপুরে গিয়াছেন।" বাবুটি আর কিছু বলিলেন না; ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। বাসার সকলেই এই কথা শুনিল।

কলিকাতার মেসের ছেলেদের অসাধ্য কাজ নাই। ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট যদি ডিটেক্‌টিভ-বিভাগ উঠাইয়া দিয়া কলিকাতার মেসের বাছাবাছা ছেলেদের উপর গুপ্ত-অনুসন্ধানের ভার দেন, তাহা হইলে অনেক রহস্যের উদ্ভেদ হইতে পারে। সেই রাত্রের

ব্যাপার শুনিয়া সকলেরই মনে সন্দেহ হইল; দুই তিনজন ছাত্র এই রহস্য-ভেদ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময়েই শুনিতে পাওয়া গেল, কবি মহেন্দ্রনাথের প্রেম-প্রবাহে তাঁহার ছাত্রের যুবতী বিধবা ভগিনী, পাঁচ হাজার টাকার অলঙ্কার ও নগদ দুই হাজার টাকা ভাসিয়া গিয়াছে।

মৃতের মৃত্যু।

—:•:—

ক

চিৎপুর রোডের উপর প্রকাণ্ড বাড়ী। একজন জমীদারের বাড়ী। মফস্বলের জমীদার; কিন্তু দীর্ঘকাল হইতে বৎসরের অধিকাংশ সময়েই সপরিবারে এই বাড়ীতেই তাঁহার বাস। জমীদার সত্যচরণ বাবু পীড়িত, রোগশয্যায় তিনি শায়িত আছেন। মস্তকের পাশে একদা সামাদানে বাতি জ্বলিতেছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর; এখনও দুইটি রমণী—একজন মাথার কাছে ও একজন পদতলে বসিয়া—তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। মাথার কাছে যিনি—তিনি সত্যচরণের প্রিয়তমা দুহিতা লীলাবতী, পদতলে তাঁহার ভাগিনেয়ী কমলা। সত্যচরণ বাবু বিপত্নীক।

কমলা বিধবা; সুপাত্রের সহিতই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল! কমলার স্বামী পল্লীগ্রামের লোক ছিলেন; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল; কিন্তু সংসর্গদোষে তাঁহার স্বামী মদ্যাসক্ত হইয়া উঠিলেন। দেশে থাকিতে সত্যচরণ বাবু তাঁহার এই দোষের জন্য তাঁহাকে কিছু মৃদু ভৎর্সনা করেন; তিনি বলিয়াছিলেন, "পরিবার প্রতিপালনের অযোগ্য ব্যক্তির জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র,"—

কমলা পরদিন সকালে উঠিয়া বালিশের নীচে পত্র পাইলেন, 'কমল, চির বিদায়।' দুই দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল, তাঁহার স্বামী পদ্মায় ডুবিয়া মরিয়াছেন। সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা।"

কমলা তাহার পর হইতেই পাঁচ বৎসরের মেয়েটিকে লইয়া মামার কাছে কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছেন। কমলাকে তিনি নিজের মেয়ের মত দেখেন। তিনি কমলার মেয়ে যোগমায়াকে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। সত্যচরণ বাবু প্রাচীন হইলেও কিঞ্চিৎ আধুনিক-তন্ত্রের লোক।

৩

সত্যচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "মা কমল, গলাটা বড় শুকিয়ে গেছে; একটু লেমনেড্ দিবি?" সে কক্ষে লেমনেড্ ছিল না! চাকরেরা পাশের একটা কুঠুরীতে ঘুমাইতেছিল। কমলা তাহাদের আর বিরক্ত করিলেন না; সবেমাত্র তাহারা খাটিয়া-খুটিয়া ঘুমাইয়াছে। নিজে তিনি যাহা পারেন, তাহা কেন অপরকে দিয়া করাইবেন, সকলেরই ত রক্তমাংসের শরীর। কমলা ধীরে ধীরে সত্যচরণের পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তিনি জানিতেন, সেই ঘরের আলমারির দেরাজের মধ্যে কতকগুলা সোডা লেমনেড্ আছে।

গৃহে প্রবেশ করিতেই কমলার বোধ হইল, দেওয়ালের গা বহিয়া একটা মানুষের ছায়া হঠাৎ একদিকে ছুটিয়া গেল। দ্বারের নিকট স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া কমলা ঘরের দিকে চাহিলেন।

দ্বারের কাছেই আলো জ্বলিতেছিল,—একটা হরিকেন ল্যাম্প।

ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ কমলার মনে ছুঠাছুটি করিতে লাগিল। এত রাত্রে এ ঘরে কে আসিল? মানুষ কি?—এতরাত্রে মানুষ কোথা হইতে, কি করিতে আসিবে? সহসা কমলার মনে পড়িল, এই ঘরে তাঁহার মামার যথাসর্ব্বস্ব থাকে।—সর্ব্বনাশ, নিশ্চয়ই চোর আসিয়াছে! কিন্তু কমলা চীৎকার করিলেন না। ঘরের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া কিছু দেখা যায় কি না, দেখিতে লাগিলেন।

চোরই বটে! কমলার সাহস লোপ পাইল; তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বারপ্রান্ত হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিবার জন্য ফিরিলেন।

চোর তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিল। সম্মুখে আসিয়া পথ আট্‌কাইয়া বলিল, "তবে চাঁদ, পালাবে কোথায়?—চেঁচিয়েছ ত, এই ছোরা বুকে বসিয়ে দিয়েছি।"—চোর একখানা বড় ছোরা বাহির করিয়া কমলার সম্মুখে ধরিল —ভয়ানক ধারালো ছোরা!

গ

কমলার সাহস নিবিয়া গিয়াছিল। তিনি ভয় ও উদ্বেগভরে বলিলেন, "আমি অনাথা, আমার কিছুই নাই, আমাকে যাইতে দাও।"

চোর বলিল, "এই ঘরের সিন্দুকে অনেক টাকা আছে; চাবি কোথায়?"

কমলা বলিলেন, "যাঁহার বাড়ী, তাঁহার কাছে।"

"আমি সেই চাবি চাই।"

কমলা বলিলেন, "আমি তাহা কিরূপে দিব?—চোরে চাহিতেছে বলিয়া চাহিয়া আনিব?"

"না, সেইটি পারিবে না। তুমি লুকাইয়া আনিয়া আমাকে দিবে, কেহ জানিতে পারিবে না। রাজী আছ?"

কমলা ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তুমি পরপুরুষ, আমি কুলনারী; তোমাকে স্পর্শ করিতে নাই; যদি থাকিত, আমি তোমার মুখে নাথি মারিতাম।"

চোর বলিল, "তবে আমি তোমার বুকে এই ছোরা বিঁধাইয়া তোমার জীবনের শেষ করিয়া যাই।"

কমলা বলিলেন, "সচ্ছন্দে, জীবনে কোন সুখ নাই।"

চোর একলম্ফে কমলার ঘাড় চাপিয়া ধরিল। কমলা হাত দিয়া আট্‌কাইতে গেলেন, চোর তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। কমলার আঙ্গুলে একটা অঙ্গুরী ছিল, অঙ্গুরীতে চোরের হাত পড়িল। নিকটেই আলো জ্বলিতেছিল; চোর সেই আলোকের উপর হাতটা টানিতেই তাহার চোখে পড়িল, অঙ্গুরীতে লেখা আছে T. P. C.—চোর হঠাৎ কমলাকে ছাড়িয়া তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিল; বোধ হইল তাহার বুকের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক ঝাঁকি লাগিয়াছে।

অবসর পাইয়াও কমলা ছুটিয়া পলাইলেন না; স্থিরভাবে সেখানে নিশ্চল ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন!

আমাদের পাঠিকাগণ হয় ত কমলার উপর রাগ করিয়া বলিতেছেন, মেয়েটা নিতান্ত হাবা।

ঘ

চোর প্রথমে কথা বলিল; "আমাকে এ অঙ্গুরীটি দেবে? আমি সিন্দুকের চাবি চাইনে।"

কমলা বলিলেন, "এটি আমার স্বামীর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন; আর কিছু নাই, এইটিই আছে। তুমি আমার প্রাণ লও, এটি লইও না। আমি যোগমায়াকে তাহার বাপের কিছু দিতে পারি নাই, এইটিই দিয়া যাইব বলিয়া রাখিয়াছি।"

এবার আর চোর স্থির থাকিতে পারিল না। কমলার দেহের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্কন্ধাবলম্বন পূর্ব্বক বলিল, "কমলা, আমি তোমাকে চিনিয়াছি। আমার মিথ্যামৃত্যুসংবাদে তুমি বিধবা সাজিয়া বসিয়া আছ। আমি মরি নাই। এখন আমি দস্যু, এ বাড়ীতে চুরী করিতে আসিয়াছি।"

চোরের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কমলা ধীরে ধীরে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হতাশভাবে বলিলেন, "তবে পূর্ব্বে যে জনরব শুনিয়াছিলাম তাহা সত্য নহে?—আমার স্বামী দস্যু! আমি বিধবা হইলাম না কেন?"

চোর বলিল, "তোমার আক্ষেপ আমি দীর্ঘকাল রাখিব না। আমি জানি, আমি তোমার স্বামী হইবার যোগ্য নহি। জানিতাম না, এ বাড়ী তোমার মামার; তুমি এখানে আছ, সে খবরও রাখি-

তাম না। এ কয় বৎসর দেশেদেশে কেবল আমোদে কাটাইয়াছি। আজ হঠাৎ পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে! তোমার জীবন আর বিড়ম্বিত করিব না; আমার জীবন-ভার আজ একদণ্ডের মধ্যে অসহ্য হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম, দেবতা, পৃথিবী, সকল ভুলিয়াছিলাম; তোমার মুখ আবার সে সকল কথা জাগাইয়া দিল। এখন একবার যোগমায়াকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহার সঙ্গে দুটি কথা বলিতে চাই। তার পর প্রায়শ্চিত্ত।"

কমলার বুকের মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গ উথলিতেছিল। তিনি প্রাণপণশক্তিতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমি দস্যুর মত এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। দস্যুর সহিত আমার মেয়ের পরিচয় করাইতে পারি না।—আমি দস্যুপত্নী, এ স্মৃতি নির্ব্বাণ হইয়া যাক্! তুমি তোমার অঙ্গুরী ফিরাইয়া লও।"—কমলা অঙ্গুরী খুলিয়া চোরের পদতলে ফেলিয়া দিলেন।

চোর ধীরে ধীরে অঙ্গুরী তুলিয়া লইল এবং তাহা বুকের পকেটে রাখিয়া বলিল, "কমল, বিদায় হইলাম; তোমার অযোগ্য স্বামীকে ক্ষমা করিও। আর যদি কখন শুনিতে পাও, তারাপ্রসন্ন মরিয়াছে, তবে নূতন করিয়া চোখের জল ফেলিও। আমি এতদিন বাঁচিয়া তোমার কাছে মরিয়াছিলাম; এতদিনে যেন মরিয়া বাঁচিতে পারি।"

চোর বাতায়নপথে অন্তর্হিত হইল; ইতিমধ্যে অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। লীলাবতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কি লো দিদি, তোর যে আঠারো মাসে বছর। লেমনেড

খুঁজে পাস্‌নি বুঝি ? একি ? তুই কাঁদচিস্ নাকি লো, চোকে যে জল ?"

কমলা ধরাধরা গলায় বলিলেন, "মর, কাঁদবো কোন্ দুঃখে ; চোকে কি একটা পোকা পড়েছে।"

লেমনেড লইয়া, উভয়ে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

৬

পরদিন একটা লোকের মৃতদেহ পূর্ব্ববঙ্গ-রেলপথের উপর পাওয়া গেল। মাথাটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; লোকটা আত্মহত্যা করিবার জন্যই যে রেলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়াছিল, তাহাতে কাহারো সন্দেহ রহিল না, কারণ তাহার পকেটে একখণ্ড কাগজ-জড়ানো একটা সোণার অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছিল ; কাগজ-খানাতে পেন্‌সিল দিয়া লেখা ছিল, "এই আত্মহত্যার জন্য আমিই দায়ী।"—আর অঙ্গুরীতে একটা নামের তিনটা সাঙ্কেতিক অক্ষর ছিল—

T. P. C.

"সুরভি-পতাকায়" এই সংবাদটি বাহির হইলে যথাসময়ে তাহা কমলার হস্তগত হইল। কমলা তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বাররুদ্ধ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া অশ্রুধারে সিক্ত হইতে লাগিলেন। সংসারের কেহই তাঁহার দুঃখ কি, তাহা জানিতে পারিল না, কেবল সর্ব্বলোকের অদৃশ্য থাকিয়া ভগবান

তাঁহার স্বামীর পতিত আত্মার কলঙ্ক ধৌত করিবার জন্য সেই সাধ্বীর পবিত্র অশ্রু নিঃসারিত করিতেছিলেন। বিধাতার রহস্য!

মামা বাবু।

—০:*:০—

১

চক্রধর চৌধুরীর উপরিউপরি অনেকগুলি সন্তান মরিয়া যাওয়াতে, তাঁহার একমাত্র বংশধর শ্যামসুন্দরের প্রতি আদর ও যত্নের মাত্রা এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তাহাতেই তাহার মস্তকটি একেবারে ভক্ষিত হইল। চক্রধর কলিকাতায় এক মহাজনের আড়তে গদিয়ানী চাকরী করিতেন। পল্লীঅঞ্চলে তাঁহার মহাজনের দুই চারিটা আড়ত ছিল। সেই সকল আড়ত তদারকের ছলে দুই একমাস অন্তর বাড়ী আসিয়া চক্রধর বাড়ীতে কয়েকদিন কাটাইয়া যাইতেন। কলিকাতায় লেখাপড়ার প্রচলন এবং শিক্ষিত লোকের সম্মান দেখিয়া তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল যে, তাঁহার ছেলেটিও লেখাপড়া শিখিয়া একটা মানুষের মত মানুষ হয়, এবং দিব্য জামাজোড়া গায়ে দিয়া দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত আফিস করে। চক্রধরের বয়স কিছু বেশী হইয়াছিল, সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, ছেলেটি মানুষ হইয়া উঠিলেই তিনি কাজে ইস্তফা দিয়া বাড়ী আসিবেন এবং পায়ের উপর পা রাখিয়া দুবেলা দুটি খাইবেন, আর হরিনাম করিবেন। বেশী কিছু

না হয় ত ছাত্রবৃত্তি পাশ করিলে ছেলে একটা মোক্তারও ত হইতে পারে। তখন তাহার অন্ন খায় কে? উক্ত ব্যবহারাজীবদিগের সম্বন্ধে চক্রধর চৌধুরীর এমনি একটা উচ্চ ধারণা ছিল।

কিন্তু বাপের সংকল্প যতই উচ্চ হোক, লেখাপড়ায় ছেলের কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। গ্রামের বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া সে পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের দলপতি হইয়া উঠিল। স্কুলে এমন অমনোযোগী ছাত্র দ্বিতীয় ছিল না। পণ্ডিত পড়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহার পেটব্যথা করিত; অঙ্ক কষিবার সময় সে শ্লেটের উপর ময়ূর আঁকিত, এবং শেষ ঘণ্টায় স্কুলের সকল ছাত্র সারি দিয়া দাঁড়াইয়া সুর করিয়া যখন কড়া-গণ্ডা আওড়াইত, তখন শ্যামসুন্দর গোলে হরিবোল দিত, আর নিকটবর্ত্তী ছেলেদের চাদরে গ্রন্থি বাঁধিয়া মজা দেখিত। পণ্ডিত মহাশয় তাহার গায়ের চাদর খুলিয়া কখন জলবিছুটি লাগাইতেন, কখন তাহার পিঠে বাখারি ভাঙ্গিতেন; কিন্তু সে সংশোধনের অতীত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রহার অত্যন্ত গুরুতর হইলে বেতের অগ্রভাগ হইতে দেহটাকে বাঁচাইবার জন্য সে দুই হাত বিস্তৃত করিয়া কঠোর আর্ত্তনাদ করিত। পণ্ডিত মহাশয় একএক দিন তিন হাত জমি মাপিয়া তাহার নাকে খত দিয়া লইতেন; কোন দিন পণ্ডিতের আদেশক্রমে তাহার দুইজন সমপাঠী তাহার দুই কাণ ধরিয়া সকল ছেলেদের সম্মুখে পাঁচসাতবার দৌড়াদৌড়ি করাইত; কিন্তু শাস্তি যতই গুরুতর হোক্, ষাঁড়ের মত শুষ্ক চিৎকার ভিন্ন, তাহার চক্ষে কেহ কোনদিন একবিন্দু অশ্রু দেখে নাই।

শেষে ছাত্রবৃত্তির তিন ক্লাশ নীচে হইতে পড়াশুনায় ইস্তফা দেওয়াতে শ্রীমান্ শ্যামসুন্দরের জীবন বেশ নিষ্কণ্টক হইয়া উঠিল। মায়ের অনেকগুলি ছেলের অকাল-মৃত্যু হওয়ায় তিনি সকালে-সকালে একটি নোলকপরা বধূ আনিয়া সংসারসুখটা ষোল-আনা রকমে ভোগ করিবেন, এমন আশা করিলেন; কিন্তু মানুষের সকল আশা পূর্ণ হয় না। পুত্রের বিবাহ দিবার পূর্ব্বেই অপূর্ণ আশা লইয়া তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল।

পুরুষের অন্নবস্ত্র এবং রূপগুণের যতই অভাব হোক, দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের প্রতি বৃদ্ধ প্রজাপতির এতই অনুগ্রহ যে, তাহার বিবাহের জন্য কখন কন্যার অভাব হয় না। বিশেষতঃ আজকাল পল্লীসমাজে ছেলে অপেক্ষা ছেলের বাপকে দেখিয়াই কন্যাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অপরিণীতা কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ পাকাইয়া তুলেন। সুতরাং গদীয়ান চক্রধরের পুত্রের বিবাহে কিছুমাত্র গোলযোগ হইল না। রামনগরের ত্রিলোচন সরকারের কন্যার সহিত শ্যাম-সুন্দরের বিবাহ স্থিরীকৃত হইল। কন্যার বর্ণ মসীকৃষ্ণ হইলেও তাহার সুবর্ণলতা নাম রাখিতে পিতামাতার আপত্তি দেখা যায় না। সেই নজীর অনুসারে কন্যার বিদ্যুল্লতা নাম রাখা হইয়াছিল। ত্রিলোচন কিছু সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছিল; তাই লোভান্ধ চক্রধর বিদ্যুল্লতার রূপের পরিচয় পাইয়াও এ বিবাহে আপত্তি করেন নাই। বিবাহের পূর্ব্বে একদিন তিনি বৃদ্ধ কুল-পুরোহিতকে এ সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু পুরোহিত ঠাকুরও কিছু আশা রাখিতেন; তাই তিনি শ্লোক

আওড়াইয়া চক্রধরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরাশর-সংহিতায় লিখিত আছে, কলিযুগে ছেলের পাস তাহার কুল এবং মেয়ের বাপের অর্থ মেয়ের রূপ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বিবাহের অচিরকাল মধ্যেই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত যুবক শ্যামসুন্দর শাশুড়ীর স্নেহ ও ঐশ্বর্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িল এবং শ্বশুরবাড়ীতেই স্থায়ী আড্ডা গাড়িল। চক্রধর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না; তিনি মনে ভাবিলেন, ছেলেটা যদি বেয়ানকে হস্তগত করিয়া দুশো পাঁচশো টাকা ঘরে আনিতে পারে, ত মন্দ কি? 'শস্যঞ্চ গৃহমাগত' চাণক্য পণ্ডিতের এই শ্লোকটার অর্থ তিনি ভালরকমই বুঝিতেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া গৃহের কথা, বা অসমর্থ বৃদ্ধ পিতার কথা শ্যামসুন্দরের বড় মনে পড়িত না।

শ্বশুরবাড়ী কিছুদিন বাস করিয়া শ্যামসুন্দর দেখিতে পাইল কতকগুলি অনাবশ্যক পরিবার সেখানে বিনা-প্রতিবাদে প্রতিপালিত হইতেছে, কিন্তু সেগুলিকে বিদূরিত করিবার কল্পনা এ পর্য্যন্ত কাহারও মনে উদিত হয় নাই। অতএব এই সুমহৎ কার্য্যে শ্যামসুন্দর আপনার মনোযোগ অর্পণ করিল।

শ্যামসুন্দরের এই অনধিকার-চর্চ্চায় তাহার খুড়শ্বশুর নবদ্বীপচন্দ্রের সহিত তাহার বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। শেষে সে শাশুড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া খুড়শ্বশুরের সহিত বিষয়-বিভাগের জন্য অত্যন্ত জেদের সঙ্গে মোকদ্দমা আরম্ভ করিল। ক্রমে জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা গড়াইল। যে কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহা উকীল, কুসুম, আর মোকদ্দমার ব্যয়ে

নিঃশেষ হইয়া গেল ; শেষবিচারে খুড়শ্বশুরেরই সুবিধা হইল। মোকদ্দমারূপ সুবৃহৎ বহ্নিচক্র হইতে যে কিছু স্থাবরসম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া, নগদ টাকা, তৈজস-পত্র, স্থবিরা শাশুড়ী এবং যুবতী স্ত্রী লইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে শ্যামসুন্দর পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল।

এখন শ্যামসুন্দরই বাড়ীর কর্ত্তা। বৃদ্ধ চক্রধর অক্ষমতাবশতঃ কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন ; এখন তিনি শুধু হরিনাম করেন ও দুবেলা দুটি খান। বৃদ্ধবয়সে আহারের প্রতি সকলেরই একটু লোভ হইয়া থাকে, বোধ হয় ইহা বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ; কিন্তু এই আহারলিপ্সাটা শ্যামসুন্দরের শাশুড়ী ও স্ত্রীর চক্ষে অতি কদর্য্য যথেচ্ছাচার বলিয়া প্রতীয়মান হইত। শ্যাম-সুন্দরের স্ত্রী যখন-তখন প্রবল বাত্যা তুলিয়া বলিত,—"আমরা যে প্রতিদিন গহনা বন্ধক দিয়ে টাকা আন্‌চি, এ কি শুধু ঐ বুড়টার জন্যে মাছের ঝোল, আর ঘি-দুধ যোগাতে !" সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ী কন্যার মতের পোষকতা করিয়া শ্যামসুন্দরকে বলিত, "আমার যে দুতোলা আছে, তাতো তোমারই। ও বুড়োটার খোরাকেই যদি সব খরচ হয়, তা হোলে কি করে চলে ?" পিতার এই অবিবেচনার বিরুদ্ধে শ্যামসুন্দর প্রথম-প্রথম কিছু বলিতে সাহস করিত না ; কিন্তু অবশেষে তাহার স্ত্রী যখন পঞ্চম ছাড়িয়া সুর সপ্তমে তুলিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "অপদার্থ মিঁঘিয়ে মিন্‌সে, তুমি বসে থাক্‌বে, আর তোমাদের বাপবেটাকে আমার বাপের টাকা ভেঙ্গে পুষবো ?"—তখন শ্যামসুন্দরের চৈতন্যোদয়

হইল। স্ত্রীর ভয়ে সে পিতার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিল। সে বেলা দশটার মধ্যে স্নান করিয়া আসিয়া আয়নাচিরুনী লইয়া দুইঘণ্টা ধরিয়া কেশবিন্যাস করিত; তাহার পর যথারীতি আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শ্বশুরবাড়ীর বাঁধা হুকাতে একটি পানের সহিত এক শিলিম তাম্রকূট সশব্দে পরিপাক পূর্ব্বক খিড়কীদ্বার দিয়া ভবানী চাটুর্য্যের বাড়ী পাশার আড্ডায় উপস্থিত হইত। ভবানী চাটুর্য্যের বাড়ী গ্রামের মধ্যে খেলা ও গল্পের আড্ডা। এখানে শ্যামসুন্দরের গল্পে অনেক রাজা-মহারাজা মারা পড়িত; আজকাল ইংরেজদের সৈন্যবল কিরূপ, রুষের ভারতাক্রমণের সম্ভাবনা আছে কি না, অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শার কি রকম নবাবী ছিল, হাইকোর্টের জজদের মধ্যে কে কেমন বিচারক, এবং ব্যারিষ্টারদের মধ্যে কে কত ভাল ইংরাজী বলিতে পারে, এই সকল বিষয়ে সে দাড়ী নাড়িয়া, মুখের নানা প্রকার ভঙ্গী করিয়া, অনর্গল এমন গল্প বলিত যে, শ্রোতৃবর্গ সবিস্ময়ে তাহার বাক্যসুধা পান করিয়া ক্লান্ত হইত না। কেহ তাহার বক্তৃতা-শক্তির প্রশংসা করিত, কেহ বলিত বাঙ্গালাদেশে তাহার মত লোক দ্বিতীয় নাই। আত্ম-প্রশংসার একটা নিবিড় ধূম্রালোক সৃজন করিয়া শ্যামসুন্দর সংসার ভুলিয়া যাইত এবং মনের সুখে অধিক করিয়া তামাক টানিত।

ইতিমধ্যে একদিন মধ্যাহ্নে স্নান করিয়া আসিয়া চক্রধর বেলা ১টা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কখন তাঁহাকে আহারের জন্য ডাকা হয়; কিন্তু কেহই বৃদ্ধকে আহারার্থ আহ্বান করিল না। অবশেষে তৃতীয় প্রহরের পর বাড়ীর মধ্যে গিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বেয়ান, রান্না হ'লো কি ?" বেয়ান মুখখানি হাঁড়ির মত করিয়া উত্তর দিল, "দুবেলা চাল সিদ্ধ করবার জন্যে ত আর কেহ দাসী বাঁদি নেই। একটা পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই, ভাতের খোঁজ করা ত আছে, ভাত আসে কোথা হতে ?" বৃদ্ধ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন; অবনতমস্তকে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায় বার্দ্ধক্য! আজ তাঁহার সংসার অরণ্য, জীবন অন্ধকারপূর্ণ, নিজ গৃহেও তাঁহার স্বাধীনতা নাই। সে দিন আর তাঁহার কিছুই আহার হইল না। তাঁহার হাতে দুই একটি টাকা ছিল, তাহাই ভাঙ্গাইয়া কোন কোন দিন দু'পয়সার চিড়া কিনিয়া তদ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেন, কোন দিন মুড়ী খাইয়া কাটাইতেন। বেয়ান শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিত, "হাতে টাকার পুটলি আছে, লুকিয়ে লুকিয়ে ভালমন্দ খাওয়া হয়, এত বড় গেরস্থালিটা কি রকম ক'রে চলে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।" বৃদ্ধ দুঃখে অভিমানে পুত্রকে কোন কথা বলিত না।

পিতার এই প্রকার দুরবস্থার কথা শুনিয়া কন্যা রাজমোহিনী নৌকা করিয়া তাঁহাকে স্বামীর কর্ম্মস্থান রতনপুরে লইয়া গেল। রাজমোহিনীর স্বামী ইন্দু বাবু রতনপুরের জমীদারের দেওয়ান। ইন্দু বাবুর আশ্রয়ে আসিয়া বৃদ্ধ কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন; কন্যার যত্ন ও পরিচর্য্যায় তাঁহার হৃদয়ের ক্ষত অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইল; কিন্তু তাঁহার তিন বৎসরের সেই ক্ষুদ্র নাতিটির প্রত্যেক দিনের সহস্র প্রকার আবদার, তাহার হাস্য-কলরব এবং সাদর-সম্ভাষণের মধুর স্মৃতি এই বিরহবিষাদক্লিষ্ট জীর্ণ প্রবাসী

বৃদ্ধের হৃদয় পীড়িত করিতে লাগিল; তাঁহার কন্যার পুত্রকন্যাগণ তাঁহার হৃদয়ের সে অভাব পূর্ণ করিতে পারিল না।

এদিকে শ্যামসুন্দর দেখিলেন আর ত বসিয়া থাকা চলে না, শ্বশুরবাড়ীর গহনাগুলি ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া আসিল; পত্নীর অসংযত রসনার উগ্রতাও অধিকতর অসহনীয়; সুতরাং বাধ্য হইয়া শ্যামসুন্দরকে অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিতে হইল। কিন্তু বড়লোকের মোসাহেবী ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তাহার পারদর্শিতা না থাকায় অগত্যা সে চাকরী-লাভের দুরাশা পরিত্যাগ করিল।

কিছু কিছু করিয়া টাকা কর্জ্জ লইয়া অবশেষে সে এক মুদি-খানার দোকান খুলিয়া বসিল। চাউল, ডাইল হইতে হাঁড়ি, কাঠ-সকল জিনিসই দোকানে সঞ্চিত হইল। কিন্তু দোকানের আয় অপেক্ষা সংসারের ব্যয় অনেক বেশী; কাজেই দোকানের মূলধন ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল; শেষে দোকানের ঝাঁপ চিরস্থায়ী রকমে বন্ধ হইয়া গেল। মহাজনেরা টাকার তাগাদা করিতে আসিলে শ্যামসুন্দর অতি গম্ভীর বিষয়ীলোকের মত উত্তর করিতে লাগিল, "রয়ে ব'সে নেও ভাই! তিন হাজার টাকা বিলেত বাকি, আদায়পত্র না হলে কি ক'রে দেনা শোধ করি?" —কলিকাতার মহাজন সুপারী, মসলা, এবং কেরোসিন তেলের জন্য অনেক টাকা পাইবে। পুনঃ পুনঃ তাগাদা দ্বারাও যখন তাহারা কপর্দ্দকমাত্র আদায় করিতে পারিল না, তখন তাহারা নালিশ করিবার ভয় দেখাইল।

কলিকাতার মহাজন নালিশ করিতে চাহিয়াছে, কথাটা গ্রামে

রাষ্ট্র হইবামাত্র শ্যামসুন্দরের গ্রামের মহাজনেরা তাহাকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। চাটুর্য্যেদের মেজবাবুর সঙ্গেই তাহার প্রণয় কিছু বেশী। তিনি মধ্যে তাহাকে দুই শত টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। সহসা একদিন তিনি শ্যামসুন্দরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "টাকাটা আমার স্ত্রীর; বড় জেদ আরম্ভ করিয়াছে, কোন রকমে ওটা শোধ করে ফেল, ভাই!"—ছোট বড় সমস্ত দেনা উদ্যতফণা সর্পের ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে প্রস্তুত হইল। তখন শ্যামসুন্দর নিরুপায় হইয়া হাজার টাকায় ভদ্রাসন বাড়ীখানি হরিপুরের বিশ্বাসদের কাছে বন্ধক রাখিয়া কতক কতক দেনাশোধ করিল। রেহেনী-তমঃসুকে তাহার পিতাকেও যথারীতি নাম স্বাক্ষর করিতে হইল। আমরা লোকমুখে শুনিয়াছি, বৃদ্ধ তাহার অন্তিমের সম্বল এই পৈত্রিক অট্টালিকাটুকু উত্তমর্ণের গ্রাসে নিক্ষেপ না করিবার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু বেয়ানের প্রবল ঝঙ্কারে সেই ক্ষীণপ্রাণ জীর্ণ বৃদ্ধের ক্ষুদ্র প্রতিবাদ আবর্ত্তময়ী ঝটিকার মুখে শুষ্কপত্রের ন্যায় উড়িয়া গেল।

বাড়ী বাঁধা দিয়া ঋণশোধ চলিতে পারে, কিন্তু সে টাকায় সপরিবারে দীর্ঘকাল ধরিয়া উদরান্নের সংস্থান হয় না; কাজেই উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্যামসুন্দর তাহার ভগিনী রাজমোহিনীর শরণাপন্ন হইল। আর কিছু না হউক, তাহার ভরসা হইল, কিছুদিন সে পাওনাদারগুলার তাগাদা হইতে রক্ষা পাইবে।

২

একটা ক্যামবিসের ছোট ব্যাগ, ছোট একটি কলিহুকা, তার

উপযুক্ত একটি কলিকা এবং সাদা কাপড়-লাগানো ঝালরওয়ালা একটা ছাতি লইয়া জামাইবাবুর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জুতা, কাপড়, কামিজ, চাদরে সুসজ্জিত শ্যামসুন্দর রতনপুরের জমিদারী কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিপিন খানসামা যখন অন্দরমহলে মামাবাবুর শুভাগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল, রাজমোহিনী তখন দোতালার একটা কুঠুরীতে পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিতেছিল, আর বিরু ওরফে বিরূপা ঝি পিঠের দিকে বসিয়া কালো কেশের ঝাড়ে বিলি দিতে-দিতে মধ্যে মধ্যে স্তুতিবাদের মৃদুমধুর বুকনি চালাইতেছিল। রাজমোহিনী তাড়াতাড়ি পুঁথি বন্ধ করিয়া ভ্রাতাকে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া লইতে আসিল; স্মিতমুখে বলিল "অনেকদিন পরে যা হোক দাদার আমাদের মনে পড়েছে। বৌ ভাল আছে ত? মাউইমা, সুধীর সকলের খবর ভাল ত?"— রাজমোহিনীর ছোটছোট ছেলেমেয়েরা চারিদিক হইতে ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়া 'মামা' 'মামা' বলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সংক্ষিপ্ত উত্তর দ্বারা ভগিনীর কৌতূহল নিবারণ পূর্ব্বক, 'মামাবাবু' একদল শিশুফৌজ-পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বিতলে চলিলেন; জলযোগের গুরুতর আয়োজন পড়িয়া গেল।

মামাবাবুর রতনপুরে শুভাগমনের পর হইতে দাসদাসী মহলে, হাটের দোকানদারদের মধ্যে, পুকুরে মাছের দলে ভারি হাঙ্গামা পড়িয়া গেল। রতনপুরের কাছারীর সম্মুখে প্রতি সপ্তাহে শনি-মঙ্গলবারে একটা করিয়া প্রকাণ্ড হাট বসিত; শনিবারের

হাটকে ‘চারের’ হাট ও মঙ্গলবারের হাটকে ‘তিনের’ হাট বলিত। দেওয়ান ইন্দু বাবুর চাকরেরা শনি-মঙ্গলবারে এই হাট হইতে সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী জিনিষপত্র কিনিয়া রাখিত। ভগিনীগৃহে আসিবার দুই এক দিন পরেই শ্যামসুন্দর ভগিনীর কাছে প্রস্তাব করিল যে, প্রতিহাটে দুটাকা আড়াই টাকার জিনিষ কেনা হয়, কিন্তু জিনিষপত্র তেমন দেখিয়াশুনিয়া ক্রয় করা হয় না, চাকর-বাকরগুলা দুই হাতে চুরি করে। রাজমোহিনী বুঝিল, দাদার মত এমন ব্যথারব্যথী সংসারে দুটি নাই; চাকরবাকরদের চুরী দেখিয়া দাদার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। বাসায় ত আরও কতলোক আছে, দেবর কমলাকান্ত ইন্দুবাবুর অধীনে জমীদার সরকারে সদর-আমিনি করিতেন; তারা ত একদিন ভুলিয়াও বলে না যে, চাকরেরা দুহাতে পয়সা লুটিতেছে।—অতএব প্রসন্নমুখে বলিল, “তুমি ত দিনকতক আছ। যে ক’দিন থাক, মাছ’তরকারীগুলো দেখে শুনে কিনে দিও।”—শ্যামসুন্দর মাথা নাড়িয়া সস্মিতবদনে ভগিনীর প্রস্তাবের অনুমোদন করিল।

পরদিন হাটবার। ক্রুসকরা জুতাজোড়াটি পায়ে দিয়া, উনপঞ্চাশ নম্বরের ধোলাই রেলির থানের কোঁচাটা গলায় বেড় দিয়া, নাভিস্থূল ভুঁড়িটি সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়া শ্যামসুন্দর হাটের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; সঙ্গে পাঁচকড়ি চাকর। ইন্দুবাবুর আদেশ, যেন হাটের দোকানদারের কাছে অন্যায় করিয়া, কি কম দাম দিয়া কোন জিনিস লওয়া না হয়। মামাবাবু বাজার-সরকারী পদটি গ্রহণ করিবার পরই এ নিয়মটি উঠিয়া

গেল। বাজারে আলুর সের ছয় পয়সা, মামাবাবুর কাছে তিনটি পয়সার বেশী আদায় করিবার যো নাই ; পাঁচ আনা মাছের সের, মামাবাবু পছন্দমত মাছ লইয়া ওজন না করিয়াই বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দেয়, তাহার পর পছন্দমত একটা দাম দিবার আদেশ হয়। শুধু তাহাই নহে ; এক হাটে পর্য্যাপ্ত তরকারী ক্রয় করিয়া তাহার কিয়দংশ বাসায় উদ্বৃত্ত থাকিলে পরের হাটে বিক্রেতাকে সেই সকল শুষ্ক তরকারী ফেরত দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন তরকারী গ্রহণ করা মামাবাবুর অন্যতম বাহাদুরী বলিয়া পরিগণিত হইত।

দোকানদারগণ এইরূপে উৎপীড়িত হইলেও তাহাতে ইন্দু বাবুর খরচের কোনরকম সাশ্রয় লক্ষিত হইত না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা খরচপত্র অধিক হইতে লাগিল। ঈর্ষাপরায়ণ দুষ্ট চাকরেরা বলাবলি করিত, মামাবাবু খরচপত্র বেশী করিয়া লেখে, কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে ; কারণ মামাবাবুর হাতে বাজারের ভার দেওয়ার পর হইতে যেমন উৎকৃষ্ট তরকারী, ভাল মাছ আসে, কোন দিনই যে তেমন হইত না ; একথা রাজমোহিনী কিছুতেই অস্বীকার করিত না।

কিন্তু মাছ তরকারী যতই উৎকৃষ্ট হোক, মামাবাবুর ব্যবহারে চারিদিকে অসন্তোষের কোলাহল নিবৃত্ত হইল না। দোকানদারেরা তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া দেওয়ানজীকে এ সকল কথা জানাইবার জন্য উৎসুক হইল ; কিন্তু একেবারে ইন্দু বাবুর কাছে না গিয়া কমলাকান্তের কাছে তাহারা সমস্ত কথা বিবৃত করিল। তাহারা ইহাও বলিল যে, দেওয়ানজী যদি সম্বন্ধীর প্রতি

প্রীতিবশতঃ এই অত্যাচারের প্রতিবিধান না করেন, তাহা হইলে রাজাবাবুর কাছেও তাহারা আরজী করিতে সঙ্কুচিত হইবে না।

কমলাকান্ত মিষ্টবাক্যে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় দিলেন।

শ্যামসুন্দর মধ্যাহ্নে ভগিনীর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল; বলিল, "এত অপমান আমার আর সহ্য হয় না। আমি কি তোমার দেওরের পাকা-ধানে মই দিয়াছি যে, সে দেওয়ানজীর কাছে আমার কথা মিথ্যা করিয়া লাগায়? আমি ত তাহার সম্পর্কে এখানে আসি নাই। যদি জানিতাম তাহার ভাত খাইতেছি, তা হইলে অনেক আগেই চলিয়া যাইতাম, আমার বাবাকেও থাকিতে দিতাম না। বাড়ীতে কি আমার ভাতের অভাব?"—কথাটা রাজ-মোহিনীর কাণে এই নূতন প্রবেশ করিতেছে না, সুতরাং ক্ষণকালের জন্য অপমান ও ক্রোধে তাহার মুখখানি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় লোহিতাভ হইয়া উঠিলেও সে অধিক কিছু বলিল না; সংক্ষেপে উত্তর করিল, "সব শুনেছি, কি বোলব বল! আমি এ বাড়ীর কেউ নই, আমার সবই অদৃষ্টের দোষ।"—অর্থাৎ দেবরকে দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিলে সে বাড়ীর কেহ হইতে পারিত, কথার ভাবখানা অনেক পরিমাণে এই রকম; এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের সুপবিত্র গভীর প্রেমবন্ধনের মধ্যে বিদ্বেষের সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে পারিলেই হয় ত সে নিজের শুভাদৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিত; কিন্তু আপাততঃ তাহার এই পবিত্র কামনা সংসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। কিন্তু চেষ্টার কোন

ত্রুটী হইল না। ইন্দুকান্ত ও কমলাকান্ত কাছারী চলিয়া গেলে সেই দিন হইতে উপরের ঘরে ভ্রাতা ভগিনীতে নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলিত; কি কথা হইত, কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু সমস্ত বেলার মধ্যে তাহাদের কথার আর শেষ হইত না; দাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হইলে সহসা তাহাদের সমস্ত গোপনীয় পরামর্শ বন্ধ হইয়া, 'আজ বড় গরম,' 'হাটে মাছের আমদানী একেবারে বন্ধ,' 'গরুর দুধ বড় কমে গেছে'—এই রকমের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ্য সমালোচনাস্রোত তাহাদের মুখ-বিবর হইতে নিঃসারিত হইত।

রতনপুরের কাছারীর সন্নিকটে একটা পুকুর ছিল, পুকুরটাতে প্রচুর মাছ। বঙ্কিম বাবু বলিয়া গিয়াছেন, নিষ্কর্ম্মা অবতারের বধ্য পুষ্করিণীর মাছ। এই মহাজনোক্ত প্রবচন অনুসারে শ্যামসুন্দরের চঞ্চল, লুব্ধদৃষ্টি অবিলম্বে এই পুষ্করিণীর মাছের উপর পতিত হইল। সুতরাং ছুইল সুতা বড়সী সমস্ত আয়োজন করিয়া শ্যামসুন্দর পুকুরে রীতিমত চার করিয়া মাছ ধরিতে বসিল; ছোট বড় রুই মৃগেল প্রভৃতি মৎস্যবংশের প্রতিদিন ধ্বংস হইতে লাগিল।

মহকুমা হইতে হাকিমেরা 'সরকোটে' বাহির হইয়া অনেক সময়ই রতনপুরে আসিয়া তাঁবু গাড়িতেন, সুতরাং উকীল মোক্তার অনেককেও এখানে আসিতে হইত; সে কয়দিনের জন্য তাঁহারা দেওয়ানজীর স্কন্ধেই ভর করিতেন। সেই সময়ে এবং অন্য আবশ্যককালে হাটে মৎস্যের অভাব হইলে ইন্দু বাবু পুষ্করিণী হইতে মাছ ধরাইয়া অতিথি-সৎকার করিতেন; কিন্তু প্রতিদিন

নিয়ম বাঁধিয়া সখের খাতিরে এমন ভাবে মাছধরা নিষ্প্রয়োজন দেখিয়া একদিন সকালে কমলাকান্ত চাকরদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "মামাবাবুকে বলিয়া দিস্, প্রত্যহ এ রকম করিয়া মাছ ধরিবার দরকার নাই।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে কমলাকান্ত কাছারী হইতে ফিরিবার সময় দেখিতে পাইলেন, শ্যামসুন্দর তখনও হুইল ফেলিয়া হুঁকা হাতে পুকুরের ধারে বসিয়া রহিয়াছে; একটা প্রকাণ্ড রুইমাছ ধরা হইয়াছে, তথাপি আশা মিটে নাই; আরো একটা ধরিতে পারিলে মনের ক্ষোভ মেটে। সমস্ত দিন কতকগুলো চাষার সঙ্গে বকাবকি করিয়া কমলাকান্তের মেজাজটা বড় ভাল ছিল না; শ্যামসুন্দর আজও মাছ ধরিতেছে দেখিয়া তিনি অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন, "কিহে, হাতে কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে পুকুরের মাছগুলো কি এমনি ভাবে নিকেশ কর্ত্তে হয়? কুটুমবাড়ী এসেছ, খাও দাও থাকো; যাতে গৃহস্থের ক্ষতি হয়, এমন কাজে হাত দিবার দরকার কি?" শ্যামসুন্দরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে বলিল, "তুমি আমাকে বলবার কে হে? আমি তোমার খাই, না পরি? আমার ভগিনীর অন্নে মানুষ হ'য়ে তুমি আমাকে এত অপমানের কথা বল? আমি তোমার কি তোয়াক্কা রাখি?" কমলাকান্ত বলিলেন, "তুমি অতি নির্ব্বোধ, তাই আমার কথায় অপমান বোধ করিতেছ। তুমি কি জান না, নিজের মান নিজের কাছে?"

সন্ধ্যার পর কমলাকান্ত ইন্দু বাবুকে আদ্যোপান্ত সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, "আমার কথায় শ্যামসুন্দর, আপনার শ্বশুর এবং বৌঠাকুরাণী অত্যন্ত অপমানবোধ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মনে আঘাত দেওয়ার দুরভিসন্ধি আমার কিছুমাত্র ছিল না। পুষ্করিণীর মাছ থাকাতে আমার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই। আপনার সুনাম এবং স্বার্থের দিকে আমার দৃষ্টি না থাকিলে আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতাম। বৌঠাকুরাণীর বিশ্বাস, আমি তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিতেছি। আপনি পিতৃতুল্য, চিরকাল আমাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমি এখানে থাকিলে ক্রমে আপনাদের মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। মানুষের মনকে বিশ্বাস করিতে নাই। কালে আমাদের পারিবারিক প্রীতিবন্ধনও শিথিল হইতে পারে। সে দুর্দ্দিন আসিবার পূর্ব্বেই আমি এখান হইতে বিদায় হইতে ইচ্ছা করি। বিশেষ চেষ্টা করিলে অন্যত্র একটা চাকরী যোটান তেমন কঠিন হইবে না।" এই কথা শুনিয়া ইন্দু বাবুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ভাই, সামান্য কথায় তোমার এরূপ বিচলিত হওয়া উচিত নয়, পৃথিবীতে মানুষকে অনেক সহ্য করিতে হয়। তোমার কথা শুনিয়া আমি মনে বড় বেদনা পাইলাম। যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোন গোল না হয়, আমি তাহার উপায় করিব।"

রাত্রে আহারাদির পর ইন্দু বাবু শ্যামসুন্দরকে বলিলেন, "তুমি এখানে আসার পর হইতে আমাদের পরিবারের মধ্যে খানিকটে অশান্তি প্রবেশ করিয়াছে। তুমি কুটুম্ব, এখানে আসিয়াছ, যতদিন

ইচ্ছা থাকিতে পার ; কিন্তু যাহাতে আমার সুনাম নষ্ট হয়, কি আমাদের সংসারটা ভাঙ্গিয়া যায়, এমন কোন কাজ যদি তোমা হইতে হয়, তাহা হইলে বড় দুঃখের কথা বলিতে হইবে। তোমাকে বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।" দুঃখে ক্ষোভে অপমানে শ্যামসুন্দর তখনই বাড়ী যাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু কেন বলা যায় না, বোধ হয় গৃহে অশনবসনের ব্যবস্থার কথা মনে করিয়া সহজে রাগ দেখাইতে পারিল না ; দুই একবার নৌকার খোঁজও হইল, নদীতীরে দুই চারিবার যাতায়াতও হইল ; তাহার পর ইন্দু বাবুর বাসা ছাড়িয়া সে এক প্রতিবেশীর বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এদিকে বাড়ী হইতে ক্রমাগত পত্র আসিতেছে, খরচপত্রের বড় অভাব হইয়াছে, আর দিনপাত হয় না ; কিন্তু তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই ; পুত্রের অতি কঠিন পীড়ার সংবাদেও সে বিচলিত হইল না, বুঝিল বাড়ীর লোকে কৌশল করিয়া তাহাকে গৃহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে চাহে। অবশেষে যখন গ্রামস্থ দুই এক জন আত্মীয় পত্র লিখিল যে, চাটুর্য্যেরা ডিক্রীজারী করিয়া তাহার অস্থাবর-সম্পত্তি ক্রোক করিয়া লইয়া গিয়াছে ; শীঘ্র কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া না আসিলে আর সেগুলি উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই, তখন শ্যামসুন্দরকে অগত্যা রতনপুর ত্যাগ করিতে হইল। রাজ মোহিনী সাহায্যস্বরূপ তাহাকে একশত টাকা দান করিল। শীঘ্র পরিশোধ করিব বলিয়া শ্যামসুন্দর তাহার নিকট হইতে আরও একশত টাকা কর্জ্জ লইল। তাহার পর ইন্দু বাবুকে বলিল, আর

চাকরী না করিলে তাহার চলিবে না। তিনি যদি কলিকাতার দুই এক জন সম্ভ্রান্ত বন্ধুবান্ধবের নামে তাহাকে দুইএকখানি সুপারিশপত্র দেন, তাহা হইলে তাহার মহা উপকার হয়। তাহার উপকার করিতে ইন্দু বাবুর আপত্তি ছিল না। তিনি তিনচারিখানি সুপারিশপত্র ও কিছু পাথেয় দিয়া শ্যামসুন্দরকে বিদায় দান করিলেন।

৩

শ্যামসুন্দর গৃহে আসিয়া কতকগুলি ক্রোকী জিনিস খালাস করিয়া লইল; পাওনাদারগণকে বলিল, "কলিকাতায় আমার চাকরী হইয়াছে, শীঘ্রই সেখানে যাইতে হইবে। এবার ফিরিয়া আসিয়াই তোমাদের সকল দেনা শোধ করিব। আর দুটো মাস চুপ করিয়া থাক।"—কেহ তাহার কথায় বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না; কিন্তু এক সপ্তাহ পরেই সে কলিকাতা চলিয়া গেল। কলিকাতার পদস্থ ভদ্রলোকের নামে যে কয়খানি সুপারিশপত্র সে লইয়াছিল, তাহা হাতে করিয়া সে উমেদারীতে বাহির হইল। কিন্তু সুপারিশ পত্র দেওয়া যত সহজ, চাকরী দেওয়া তত সহজ নহে। ইন্দু বাবুর বন্ধুগণের মধ্যে কেহ বলিলেন, "তুমি কিছুদিন আগে আসিলে সুবিধা হইতে পারিত, এখন ত উপস্থিত কিছু সুবিধা দেখিতেছি না।"—কেহ বলিলেন, "মাসখানেক পরে আসিও, তখন দেখা যাইবে।" এক জন বলিলেন "ইন্দু বাবু ইচ্ছা করিলেই ত রতনপুর-ষ্টেটে তোমার একটা কাজ করিয়া দিতে

পারিতেন। ইন্দু বাবু আবার এজন্য আমাকে লিখিয়াছেন! এখন যে কিছু করিতে পারিব, এমন আশা নাই।"

• সহসা এদিকে সে সংবাদ পাইল, কৃষ্ণনগরে তাহার শ্যালীপতি তারাপ্রসন্ন বিশ্বাস অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছে। তারাপ্রসন্নের অনেকগুলি নগদ টাকা আছে বলিয়া তাহার শুনা ছিল; এই অবসরে সে তাহা হস্তগত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল-না। দারজিলিং মেলে চাপিয়া সেইদিনই রাত্রে কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণনগরে প্রায় তিন মাস বাস করিয়া মিষ্টবাক্যে শ্যালিকার মন ভিজাইয়া কলে কৌশলে যে কিছু টাকা হস্তগত হওয়া সম্ভব, তাহা বাহির করিয়া, আর কোথায় কিরূপে অর্থসংগ্রহ হইতে পারে, তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় সে গ্রামস্থ এক জন লোকের মুখে সংবাদ পাইল, তাহার ভগিনীপতি ইন্দু-কান্ত বাবু রতনপুরে সাংঘাতিক পীড়িত, জীবনের আশা অতি অল্প।

শরতের রৌদ্রময় স্থির-মধ্যাহ্নে আকাশের অতি ঊর্দ্ধদেশে দিগন্তের ক্রোড়ে সংলগ্ন থাকিয়া শকুনি যেমন ধরাতলের অতি দূরতর প্রদেশে শিকারের আশায় চাহিতে থাকে এবং সহসা কোথাও খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পাইলে তীক্ষ্ণলক্ষ্যে ক্রুতপক্ষে সেই দিকে ধাবিত হয়, শ্যামসুন্দরও সেইরূপ ত্বরিতগতিতে সেইদিনই রতনপুরে যাত্রা করিল। জিনিসপত্র ভাল করিয়া গুছাইয়া লইবারও অবসর হইল না।

· শ্যামসুন্দর যে দিন রতনপুরে পৌঁছিল, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে

ইন্দুবাবু কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দর দেখিল, কমলাকান্ত ভ্রাতৃশোকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান লুপ্তপ্রায়; বর্ষার দুর্দ্দমনীয় জলপ্রবাহে জীর্ণ বাঁধের মত তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য-বন্ধন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া শ্যামসুন্দরের চক্ষে পৈশাচিক আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। অনন্তর শোকবিদগ্ধা ভগিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া আয়াস-বিগলিত অশ্রুর সহিত কিঞ্চিৎ কপট সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক বলিল, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ত হইয়া গিয়াছে, সে জন্য আর শোক করিয়া কি হইবে? এখন লোক-জনের কাছে যে কিছু পাওনা আছে, সময় থাক্‌তে তা আদায় করবার চেষ্টা দেখ। কমলাকান্ত যদি টাকাটা কোন কৌশলে আদায় ক'রে লয়, তা হ'লে তোমার হাতে ঘটি পড়িবে।" উদ্বেলিত শোকাবেগ দমন করিয়া রাজমোহিনী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল, "আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেল গো, ছেলে-পিলের জন্যে একটা পয়সা সম্বল রেখে যায়নি, সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে কেবল সকল গুষ্টির পেট ভরিয়েছে। আমার যে দশ টাকা পাওনা আছে, দাদা, তুমিই আদায়পত্র কর। আর আমার কে আছে, কাকে বিশ্বাস করবো? সুসময়ে সকলেই আপনার হয়, অসময়ে কেউ ফিরেও তাকায় না। তুমি মায়ের পেটের ভাই ছিলে, তাই আমার এ বিপদের কথা শুনে দৌড়ে এসে মাথা দিয়ে পড়েছ।" ইত্যাদি।

ইন্দু বাবু পাকা লোক ছিলেন, তিনি বিনা লেখাপড়ায় কাহাকেও এক পয়সা কর্জ্জ দেন নাই। হাতচিঠা, হ্যাণ্ডনোট,

খত প্রভৃতিতে প্রায় ছয় সাত শত টাকার কাগজ রাজমোহিনীর হস্তে ছিল। রাজমোহিনী সমস্ত কাগজপত্র ভ্রাতার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাহার উপর টাকা আদায়ের ভারার্পণ করিল; রতনপুরের বাস জন্মের মত উঠিয়া গেল। পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া নিরাভরণা শুভ্রবেশিনী বিধবা ছয়বৎসর পরে ভিখারিণীবেশে বাসস্থান গোবিন্দপুরে ফিরিয়া আসিল।

কমলাকান্তই এখন এই বৃহৎ পরিবারের একমাত্র আশ্রয়। তিনি একাকী অপেক্ষাকৃত একটা ছোট বাসা ভাড়া করিয়া ভগ্ন-হৃদয়ে,নিরুৎসাহচিত্তে প্রভুর কাজ করিতে লাগিলেন। জীবনের সে সাহস, চিত্তের সে প্রফুল্লতা, মনের সে শান্তি, সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; শুধু সর্ব্বদর্শী, সুখদুঃখের প্রতি চির-উদাসীন, কঠোর কাল তাঁহার চক্ষের উপর একখানা বিষাদাচ্ছন্ন কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া তিনি জগতের প্রত্যেক দ্রব্য, জীবনের পরিবর্ত্তন, ঘোর মসীচিহ্নে চিত্রিত দেখিতে লাগিলেন। দুই মাস আগেকার সেই পুলককম্পিত, আলোক-প্রদীপ্ত বসুন্ধরা যেন কতদূরে এক অন্ধকার-সমাকীর্ণ অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে। তাই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তিনি যখন সন্ধ্যাকালে তাঁহার নির্জ্জন কুটীরে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন জীবনের প্রতি একটা নিদারুণ অনাস্থায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত; তিনি আলোকহীন, শব্দহীন, নির্জ্জন গৃহের বারান্দায় একখানি জীর্ণ মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া দেখিতেন, মশকের দল পরিপূর্ণ ক্ষুধা সঞ্চয় পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী পঙ্কিল

জলাশয়ের সন্নিকটে কচুবনের ঊর্দ্ধে ঝঙ্কার আরম্ভ করিয়াছে ; গৃহপ্রান্তস্থ সুবৃহৎ নিমগাছের ভিতর দিয়া সন্ধ্যাবায়ু তাহার নিবিড় পত্ররাশিকে কম্পিত করিয়া সন্ সন্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে, এবং ঊর্দ্ধাকাশে নক্ষত্রগুলি নতনেত্রে তিমিরমগ্ন ধরণীর দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাঁহার সুখশান্তিহীন, চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয় এই নিঃসঙ্গ প্রবাসে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত বেদনাপ্লুত সহস্র স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া প্রবল দুঃখে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিত ; এবং দৈবাৎ অদূরবর্ত্তী সৌধবাতায়নে তাঁহার দৃষ্টি পড়িলে তিনি দেখিতে পাইতেন, সেখান হইতে কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইয়া অট্টালিকাপ্রান্তবর্ত্তী পুকুরের জলের বায়ুচঞ্চল হিল্লোলের উপর একখানি জ্যোতিঃ-মেখলার সৃষ্টি করিয়াছে ; আর বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া যে গৃহে তিনি জ্যেষ্ঠ-সহোদরের সহিত পরমসুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই গৃহে রতনপুরের নূতন দেওয়ান হরিচরণ বাবু বন্ধুবর্গের সহিত মহানন্দে বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেছেন। সেই গীতোচ্ছ্বাস নির্দ্দয় অদৃষ্ট-দেবতার কঠোর পরিহাস-হাস্যের ন্যায় তাঁহার কাণে আসিয়া বাজিত ; সমস্ত বিশ্ব-নিয়মের দুর্ব্বোধ্য রহস্য তাঁহার নিকট কিছুমাত্র স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত না ; অবশেষে যখন বৃদ্ধা ঝি আসিয়া বলিত, "ছোট বাবু, উনন ধরান হয়েছে"—তখন তিনি ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিতেন ; কিন্তু তাঁহার অনন্ত দুশ্চিন্তা নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মত হৃদয়ের উপর দিবারাত্রি একটা বিরাট লৌহভার চাপাইয়া রাখিত।

শ্যামসুন্দর কিন্তু এখনও তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় বিরত হইল না। দুর্ব্বৃত্ত সয়তান আদিমাতা ইভকে শুধু স্বর্গ ভ্রষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; তাহারই অনিষ্টকারিতায় মানবের সহিত মৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কমলাকান্তের নিরুপায় পরিবার যাহাতে অনাহারে বিনষ্ট হয়, সেজন্য শ্যামসুন্দর তাঁহার চাকুরীর স্থলেও কুঠারাঘাত করিবার সঙ্কল্প স্থির করিল। সে রাষ্ট্র করিয়া দিল যে, কমলাকান্ত তাহার বিধবা ভগিনী ও তাহার পুত্রকন্যাগুলিকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। সেই এখন বিপন্ন পরিবারের একমাত্র আশ্রয়। এই হেতুবাদে সে জমীদারের নিকট একটি চাকুরী প্রার্থনা করিল! কিন্তু যখন অকৃতকার্য্য হইল, তখন ভগিনীর পাওনা টাকা আদায় করিয়া তাহার ভূতপূর্ব্ব 'ইয়ার'বর্গের সঙ্গে নানা কুক্রিয়ায় তাহা উড়াইতে লাগিল।

এদিকে ভগিনী ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিল, "দাদা, কত টাকা আদায় হইল, শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে, টাকার অভাবে আমাদের বড় কষ্ট হইতেছে।" শ্যামসুন্দর দুই পাঁচখানা পত্র পাওয়ার পর উত্তর দিত, "তোমার দেবর বিপক্ষতাচরণ করিয়া টাকা আদায়ে বাধা জন্মাইতেছে। দেনদারেরা টাকা দিতে চাহে না। যাহার নিকট একশত টাকা পাওনা আছে, এক পয়সা সুদ দেওয়া দূরের কথা, সে পঞ্চাশ টাকার বেশী দিতে চাহে না। টাকাগুলি একেবারে যায় দেখিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই আদায় করিতেছি।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর শ্যামসুন্দর ভগিনীর নিকট একশত

টাকা পাঠাইয়া দিল, এবং ছয়মাসকাল রতনপুরে থাকিয়া দেনদারদিগকে কিছু কিছু টাকা রেহাই দিয়া সমস্ত টাকা লইয়া বাড়ী আসিল।

ইন্দুবাবুর বাড়ী হইতে শ্যামসুন্দরের গৃহ অধিক দূর নহে। দাদা বাড়ী ফিরিয়াছে শুনিয়া রাজমোহিনী আশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে তাহার সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্যামসুন্দর আর সে দিকে অগ্রসর হইল না। রাজমোহিনী কতবার ডাকাইয়া পাঠাইলেন, কিন্তু শ্যামসুন্দরের কিছুতেই অবসর হয় না। অগত্যা একদিন রাত্রে ভগিনী ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য পিতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজমোহিনী সুখ ও সৌভাগ্যের দিনে পিতৃগৃহে আসিলে সমস্ত বাড়ীখানি পৌরবধূগণের আন্দোলনে গুঞ্জিত হইয়া উঠিত; রাজপুত্রবধূর ন্যায় রাজমোহিনীকে কোথায় রাখিবে তাহা তাহারা ভাবিয়া পাইত না, তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সামান্য অযত্ন-সম্ভাবনায় সকলে সর্ব্বদা আতঙ্কিত থাকিত; আর আজ সেই গৃহে অবজ্ঞাত, অনাথা, দুঃখিনী অনাহুতভাবে কতকাল পরে একাকিনী পদক্ষেপ করিতেছেন! শোকে দুঃখে তাঁহার বক্ষস্থল ফাটিয়া চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কম্পমান পদদ্বয়কে বহুকষ্টে স্থির রাখিয়া ভ্রাতার সম্মুখে গিয়া অবনতমস্তকে অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিলেন, "দাদা, এতবার ডেকে পাঠালাম, একবারও দেখা করবার সময় হইল না। দুর্দ্দিনে তুমিও আমাকে পরিত্যাগ কল্লে?"—এই প্রকার অতর্কিত আক্রমণে শ্যামসুন্দর কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল;

কিন্তু সে বুদ্ধিমান; দুর্ব্বলতা সারিয়া লইয়া বলিল, "এতদিন তোমারই কাজে বিদেশে ঘুরে বেড়ালেম, এখন তুমি একথা বলিবে ত!" রাজমোহিনী বলিলেন, "শুনেছি আমার সমস্ত টাকাই আদায় হয়েছে, কিন্তু একটি শো টাকার বেশী ত পাইনি। আমি যে একেবারে সম্বলহীন, টাকাগুলো না পেলে আমার গতি কি হবে?" শ্যামসুন্দর উপেক্ষাভরে কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে উত্তর করিল, "কে বল্লে, তোমার সমস্ত টাকা আদায় হয়েছে? বেশী বেশী সুদের লোভে যত লক্ষ্মীছাড়া ব্যাটাদের টাকা কর্জ্জ দিয়েছিলে, এক পয়সা আদায় কর্ত্তে হায়রাণ হয়ে যেতে হয়। তোমার দু'শ টাকার মধ্যে একশো পাঠায়েছি, আর মোটে একশো আদায় হয়েছে। আমি ছ'মাস সেখানে বাসা করে থেকে টাকা আদায় করেছি। সেখানে মাসে আমার পনেরো টাকা খরচ হয়েছে, ছ'মাসের দরুণ এই ৯০৲ টাকা বাসাখরচ বাদে আর থাকে দশ টাকা। চাটুর্য্যের বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ আছে, এখন আর বিলম্ব করবার সময় নেই; আর এক সময় টাকা কটা তোমাকে ফেলে দেব।" এই কথা বলিয়া শ্যামসুন্দর নিমন্ত্রণরক্ষায় বাহির হইল। রাজমোহিনী ব্যস্তভাবে ডাকিলেন, "দাদা, শোন, একটা কথা শুনে যাও। কত টাকার মধ্যে কত টাকা আদায় হ'ল, তার একটা হিসাব আছে ত?" শ্যামসুন্দর ফিরিয়াও চাহিল না; শ্যামসুন্দরের শাশুড়ী বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তোমার এ কি রকম বিবেচনা, বাছা; দেখছো ছেলে বেরুচ্ছে; এখন এ রকম করে কি পিছনে ডাকে? টাকাকড়ি চাহিবার ত সময়

অসময় আছে। টাকা না থাকে কার? আমার ত এককালে কত টাকা ছিল। টাকা থাক্‌লেই কি এমন করে চক্ষুলজ্জা ঘুচোয়? আপন ভাই আহার-নিদ্রা ছেড়ে ছ'টা মাস হায়রাণ হয়ে তোমার টাকা আদায় করে দিল, আর তুমি কি না তার সব হিসাব কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিতে এসেছ। খুব মেয়ে ত তুমি বাছা?" রাজমোহিনী আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, বহির্দ্বারের কপাট দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সকাতরে বলিলেন, "ভগবান, সর্ব্বস্ব গেল, আমি দাঁড়াব কোথা?" তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নতদৃষ্টিতে বোধ হইতেছিল যেন তিনি অবমানিতা অভিমানিনী জানকীর ন্যায় জননী বসুমতীর নিকট নীরবে প্রার্থনা করিতেছিলেন; "মা তুমি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তোমার কোলে আমাকে স্থান দাও।"

সেদিন শরৎকালের জোৎস্নাবিধৌত মধুর রাত্রি। পূর্ব্বাকাশে উজ্জ্বল চন্দ্র হাসিতেছিল; চারিদিক নিস্তব্ধ, গ্রাম্য-কোলাহল নৈশ-প্রশান্তির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কেবল মানবের সুখদুঃখে একান্ত উদাসীন একটা বিরহী পাখী অদূরবর্ত্তী তরুপল্লবের অন্তরাল হইতে এই জ্যোৎস্নাবিহ্বলা নিশীথিনীর মধ্যে দীর্ঘস্বরে আপনার একক জীবনের অন্তর্ব্যথা চরাচরে ব্যক্ত করিতেছিল। এমন সময় পঞ্চত্রিংশতিবর্ষ বয়স্কা একটি গৃহস্থ রমণী ধীরপদবিক্ষেপে শ্যামসুন্দরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে রাজমোহিনী প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। রমণী ধীরে ধীরে রাজমোহিনীর নিকট আসিয়া বিশীর্ণ

মৃণালের ন্যায় তাঁহার শোভাহীন নিরাভরণ প্রকোষ্ঠ দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া সকরুণ স্নেহোদ্বেলিতকণ্ঠে বলিলেন, "দিদি আমরা থাকিতে তোমার দুঃখ কি ? এতদিন তুমি আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছ, এখন ও সংসারে কর্ত্রী হইয়া আমাদিগকে সংসারের কাজকর্ম্ম শিখাও। তোমার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি। সম্পদের দিনে আমরা কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকি নাই, এই বিপদের দিনেও পরমেশ্বরের নাম করিয়া বুকের ব্যথা ঢাকিয়া, এস আমরা আরও কাছাকাছি হইয়া থাকি, যেমন করিয়াই হোক দিন কাটিবেই।"—এই মধুরহৃদয় পুণ্যবতী সাধ্বী কমলাকান্তের প্রেমময়ী পত্নী—পদ্মমুখী।

সম্পূর্ণ।

এই শেষোক্ত গল্পদুইটি প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের রচনা ; তাঁহার সম্মতিক্রমে গল্পদুটি এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন-প্রণীত

পুস্তকাবলি

১।	হিমালয় (চতুর্থ সংস্করণ)		১।০
২।	প্রবাসচিত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ)		১৲
৩।	পথিক	” ”	১৲
৪।	নৈবেদ্য	” ”	॥০
৫।	ছোটকাকী	” ”	৸০
৬।	নূতন গিন্নী		॥৵০
৭।	দুঃখিনী		৸০
৮।	পুরাতন পঞ্জিকা		৸০
৯।	বিশুদাদা		১।০
১০।	হিমাদ্রি		৸০
১১।	কাঙ্গাল হরিনাথ (প্রথম খণ্ড)		১।০
১২।	ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড)		১।০
১৩।	করিম সেখ		৸০
১৪।	আমার বর		১।০
১৫।	সীতাদেবী		১৲
১৬।	পরাণ মণ্ডল		১।০
১৭।	অভাগী		॥০
১৮।	কিশোর		১৲

আমার য়ূরোপ-ভ্রমণ।

(প্রথম খণ্ড)

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত; উৎকৃষ্ট আর্ট পেপারে আগাগোড়া ছাপা, প্রায় পাতায় পাতায় সুন্দর ছবি, বহুমূল্য রেশমী কাপড়ে বাঁধাই। উপহার দিবার এমন মনোরঞ্জন বই অতি কমই আছে। মূল্য অতি কম, ১।০ সিকা মাত্র।

কাঙ্গাল হরিনাথের

বিজয় বসন্ত

দশ সংস্করণ

কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয় বসন্ত' এক সময়ে উপ-ন্যাস পাঠকগণের হৃদয় হরণ করিয়াছিল। এমন সুন্দর উপন্যাস সেকালে আর ছিল না—ইহা পাঠ করিয়া কতজন কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছে। মধ্যে ক'তক দিন 'বিজয় বসন্ত' ছাপা ছিল না; এখন পুনরায় চতুর্দ্দশ সংস্করণ ছাপা হইল। এবার ছবিও দেওয়া হইয়াছে। এ সংস্করণের হাজার বই দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য আট আনা মাত্র।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।